Interest free Economics
সুদমুক্ত অর্থনীতি

ডা. জাকির নায়েক

অনুবাদক
মনিরুজ্জামান খান
বি.এস.এস. (অনার্স) এম.এস.এস (অর্থনীতি)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদনায়
মোঃ আব্দুল কুদ্দুস
বি.এ. (প্রথম শ্রেণীতে প্রথম); এম.এ. (প্রথম শ্রেণীতে প্রথম)
এম.এম. (অল ফার্স্ট ক্লাশ অ্যান্ড স্কলারস)
বি.এস.এস. (অনার্স) এম.এস.এস (অর্থনীতি), ঢা. বি.
প্রবেশনারি অফিসার, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.

পিস পাবলিকেশন-ঢাকা
৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

بسم الله الرحمن الرحيم

সুদমুক্ত অর্থনীতি

আজকের এ অনুষ্ঠানে ইসলামিক রিসার্স ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমি আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি।

বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষপটে মানব সমাজের সাথে সম্পর্কিত নানাবিধ সমস্যা ও তার সমাধানের ক্ষেত্রে অর্থনীতি এক বিরাট ভূমিকা পালন করে চলছে। বিশেষ করে, সামাজিক ন্যায়বিচার ও সামাজিক কল্যাণের মতো বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে। আমাদের ইসলামিক রিসার্স ফাউন্ডেশন, আন্তর্জাতিকভাবে স্বনামধন্য পণ্ডিতদের নিয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আলোচিত বিষয়ের ওপর সেমিনার আয়োজন করে চলছি। আন্তর্জাতিকভাবে এসব আলোচিত বিষয়গুলো হলো : নারী অধিকার, মানবাধিকার এবং বিভিন্ন প্রকার সামাজিক ন্যায়বিচার ও সামাজিক পদ্ধতি।

অর্থনীতি এসবের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। কারণ বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা যারা– বিশ্ব অর্থনীতির চালিকা শক্তি যেমন বিশ্বব্যাংক, IMF, এরা বর্তমানে যে নীতি চলছে তার বাস্তবায়ন ও সমাধান করে থাকে এবং এসব সংস্থাগুলো প্রতিনিয়ত নানাবিধ সমস্যা এবং অদক্ষতার মোকাবিলা করে অগ্রগতির দিকে এগুচ্ছে।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক লোক ইসলামিক অর্থব্যবস্থা অধ্যয়ন করছে এবং তুলনামূলক অধ্যয়নও করছে। ইসলামী অর্থব্যবস্থার মৌলিক একটি বৈশিষ্ট্য যে সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থার বর্তমান প্রেক্ষাপটে সমাজের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কি-না এবং এর বাস্তবায়ন আদৌ সম্ভব কিনা, তাও ভাবতে শুরু করেছে। এ বিষয়েই কথা বলতে ডা. জাকির নায়েককে 'কুরআনের আলোকে সুদমুক্ত অর্থনীতি' বিষয়ে আলোচনা করার জন্য অনুরোধ করছি। তিনি মূলত প্রথমে ইসলামী অর্থব্যবস্থার মৌলিক নীতির ওপর আলোচনা করবেন এবং এর বাস্তবায়ন সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর দিবেন।

পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার ২৭৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَابَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ـ

অর্থ : "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় এবং সুদের অবশিষ্ট যা আছে তা মাফ করে দাও, যদি তোমরা মুমীন হও।"

আজকের এ মহতি সভায় আমি আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। এ অনুষ্ঠানের চেয়ারম্যান আগেই উল্লেখ করেছেন, আজকের আলোচনার বিষয় হলো 'কুরআনের আলোকে সুদমুক্ত অর্থনীতি'।

'রিবা' শব্দটি কুরআনে ৮ বার এসেছে। 'রিবা' শব্দটি কুরআনের যে সকল স্থানে উল্লেখ রয়েছে। সেগুলো নিম্নরূপ :

সূরা রূম, পারা ১৩, আয়াত ৩৯।

সূরা নিসা, পারা ৪, আয়াত ১৫১।

সূরা আলে ইমরান, পারা ৩, আয়াত ১৩০।

সূরা বাকারা, পারা ২, আয়াত ২৭৫, ২৭৬, ২৭৮, ২৮০।

'রিবা' শব্দটি বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে মোট ৮ বার উল্লেখ করা হয়েছে। 'রিবা' শব্দটি প্রথমে নাযিল হয় সূরা রূমের ৩৯ নং আয়াতে। এ আয়াতে বলা হয়েছে–

وَمَا اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا فِيْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ـ
وَمَا اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ـ

অর্থ : "মানুষের ধনসম্পদে তোমাদের ধনসম্পদ বৃদ্ধি পাবে, এ আশায় তোমরা সুদে যা কিছু দাও, আল্লাহর কাছে তা বৃদ্ধি পায় না। পক্ষান্তরে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় তোমরা যে যাকাত দিয়ে থাকো, তারই দ্বিগুণ লাভ করে।"

'রিবা' শব্দটির অর্থ আসলের অতিরিক্ত যোগ হওয়া। কুরআন এ আসলের অতিরিক্ত যোগ হওয়াকে অবৈধ বলে ঘোষণা করেছে। পদ্ধতিগতভাবে কুরআন যখন প্রথম 'রিবা' শব্দটি উল্লেখ করেছে তখন কুরআন বলে নি যে, 'রিবা' হারাম বা রিবা নিষিদ্ধ। যেমন সুরা রূমের ৩৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে।

'রিবা' সম্পর্কে যখন কুরআনে এসেছে, এটা ঠিক কুরআনে মদপান সম্পর্কে যেমন পর্যায়ক্রমে নিষেধাজ্ঞা এসেছে সেরকম।

কুরআন প্রথম যখন মদপান সম্পর্কে উল্লেখ করেছে তখন তা মদের অন্তর্নিহিত ভালোমন্দ দিক সম্পর্কে আলোকপাত করেছে। যেমন সূরা বাকারার ২১৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ـ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ
لِلنَّاسِ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ـ

অর্থ : "তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলুন এ দুটির মধ্যে রয়েছে মহাপাপ, আর মানুষের জন্য উপকারিতাও রয়েছে। তবে এগুলোর পাপ উপকারিতা অপেক্ষা অনেক বড়।"

কুরআনে আল্লাহ পাক মদকে একসাথে নিষিদ্ধ করেন নি। বরং মদপানকে আল্লাহ পর্যায়ক্রমে হারাম করেন। যেমন এ সম্পর্কে পরবর্তীতে আল্লাহ পাক সূরা নিসার ৪৩ নং আয়াতে বলেন–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى
تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ ـ

অর্থ : "হে ঈমানদারগণ! তোমরা মদ্যপ অবস্থায় নামাযের নিকটবর্তী হয়ো না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা যা বলছো তার মর্মার্থ না বুঝতে পারো।"

এ আয়াতে মদপান করে মাতাল অবস্থায় নামায আদায় করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এরপর চূড়ান্তভাবে মদপানকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে পবিত্র কোরআনের সূরা মায়িদার ৯০ ও ৯১ নং আয়াতে। এ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ اِنَّمَا يُرِيْدُ
الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ـ

অর্থ : "হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, মূর্তি ও শুভ-অশুভ নির্ধারণের তীর অপবিত্র শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা থেকে বিরত থাক যাতে তোমরা সফল হও।

শয়তান মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাধ্যমে শত্রুতা ও হিংসা সৃষ্টি করতে চায়। তোমরা কি এসব বস্তু থেকে বিরত থাকবে?"

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর মদ বহন করে মদীনার রাস্তায় ঢেলে ফেলা হয় এবং কখনো তা আর পান করা হয় নি। এভাবে পর্যায়ক্রমে মদ নিষিদ্ধ হয়েছে। একইভাবে সুদও পর্যায়ক্রমে নিষিদ্ধ হয়েছে। প্রথম যখন সুদ 'রিবা' শব্দটি উল্লেখ করা হলো তখন বলা হলো 'তোমরা কি আল্লাহকে ভালোবাসো?'

সুদ সম্পর্কে পরবর্তী যে আয়াত নাযিল হয় সূরা নিসার ১৬১ নং আয়াতে–

وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ـ

অর্থ : "আর এ কারণে যে, তারা সুদ গ্রহণ করতো অথচ এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল। এবং এ কারণে যে, তারা অপরের সম্পদ ভোগ করতো অন্যায়ভাবে। বস্তুত আমি কাফেরদের জন্য তৈরি করে রেখেছি বেদনাদায়ক শাস্তি।"

কিছু নির্দিষ্ট খাদ্য যেমন উটের গোশত, ভেড়ার গোশত, ছাগলের গোশত, ষাড়ের গোশত, মুরগীর গোশত এগুলো তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল (ইহুদিদের জন্য)। কারণ, তারা আল্লাহর পথে বাধাদান করতো, তারা সুদ গ্রহণ করতো, যদিও তা তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল।

তারপর সূরা আল-ইমরান-এর ১৩০ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَاْكُلُوْا الرِّبٰۤوا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ـ وَاتَّقُوْا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ

অর্থ : "হে ঈমাদনারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ খেয়ো না, আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো, যাতে তোমরা কল্যাণ অর্জন করতে পারো।"

কিন্তু অনেক মুসলমান আছে যারা জোর দিয়ে বলে যে, কুরআন যে সুদের কথা বলেছে তা মানি লন্ডারিং-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, যখন (মানি লন্ডার) জনগণকে ঋণ দেয় এবং মাত্রাতিরিক্ত হারে সুদ গ্রহণ করে। কুরআন মাত্রাতিরিক্ত সুদ (Usury) নিষিদ্ধ করেছে কিন্তু Interest নিষিদ্ধ করে নি– যা বর্তমানের আধুনিক ব্যাংকগুলো নিয়ে থাকে। আমাদের Usury শব্দের অর্থ বুঝা উচিৎ Oxford dictionary-এর

মতে, 'The Practice of lending money to people at unfairly high rates of interest' অর্থাৎ অন্যায্যভাবে অর্থ ধারের ব্যবসা। তারা বলে, কুরআন এ মাত্রাতিরিক্ত হারে (Usury) সুদের লেনদেন হারাম করেছে কিন্তু বর্তমানের আধুনিক ব্যাংকগুলো সুদ (Interest) নেয় তা নিষিদ্ধ করা হয় নি।

Oxford dictionary-এর মতে, Interest-এর অর্থ, ঋণের অর্থ ব্যবহারের জন্য যে পরিমাণ অর্থ দেওয়া হয়। অর্থাৎ, অর্থ ঋণ নিয়ে ব্যবহারের জন্য অর্থ প্রদান এবং Usury-এর অর্থ হলো অন্যায়ভাবে, অন্যায্যভাবে বিশেষ করে মাত্রাতিরিক্ত হারে সুদের ঋণের লেনদেন। অল্প কথায়, Usury-এর অর্থ হলো মাত্রাতিরিক্ত সুদের হার।

'রিবা' অর্থ হলো, আসলের সাথে অতিরিক্ত যোগ বা আসলের ওপর বৃদ্ধি। এটা অন্যায্য যোগ বা বৃদ্ধি এবং প্রথমে উভয়ই উপকৃত হয়। Usuary হলো সুদেরই একটি অন্যরূপ তা ছোট হোক বা বড় হোক, রিবা, তা Interest বা Usury। এটা কুরআনে নিষিদ্ধ।

আরো অনেক মুসলমান আছেন যারা যুক্তি দেখান যে, সুদ হলো একপ্রকার ব্যবসা। সুতরাং কেন তা হারাম হবে, যেখানে বিশ্বময় সম্পদের লেন-দেন সুদের মাধ্যমেই হচ্ছে, তাদের জন্য কুরআন স্পষ্ট জবাব দিচ্ছে। সূরা বাকারার ২৭৫ নং আয়াতে—

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ـ

অর্থ : "আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন রিবাকে করেছেন হারাম।"

আর তিনি Interest বা Usury-কে হারাম করেছেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে এ নির্দেশনা পাওয়ার পরও কুরআনে আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন কিন্তু সুদকে হারাম করেছেন এবং যারা সুদের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে তারা শাস্তির শিকার হবে এবং তারা চিরদিনের জন্য জাহান্নামে থাকবে।

এর পরবর্তী আয়াতে ধারাবাহিকভাবে বলা হয়েছে,

"আল্লাহ তাআলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান খয়রাতকে বর্ধিত করেন, আল্লাহ পছন্দ করেন না কোনো অবিশ্বাসী পাপীকে।"

আবার কোনো কোনো মুসলিম যুক্তি দেখান যে, কুরআন যে রিবার কথা উল্লেখ করেছে তা রিবা ইসতিলাক। ইসতিলাক হলো, যখন একজন ব্যক্তি অন্য এক

ব্যক্তিকে তার জীবনযাপনের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য অর্থ ঋণ দেয় এবং এ লোনের (ধারের) ওপর সে সুদ আদায় করে। সংক্ষেপে এ প্রকার রিবা হলো রিবা ইসতিলাক যা কুরআন নিষিদ্ধ করেছে। কিন্তু অন্য প্রকার সুদ যা বর্তমানের আধুনিক ব্যাংকগুলো ব্যবসা করার জন্য ঋণের ওপর ধার্য করে তা কুরআন নিষিদ্ধ করে নি। আমাদের বুঝতে হবে যে, কুরআন কী বলতে চাচ্ছে। আমি কয়েকটি আয়াত তিলাওয়াতের মাধ্যমে আমার বক্তৃতা শুরু করেছিলাম। আমি তিলাওয়াত করেছিলাম সুরা বাকারার ২৭৮ নং আয়াত। এখানে বলা হয়েছে–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ -

অর্থ : "হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকো।"

এরপরের আয়াতটি মহানবী ﷺ-এর ওপর নাজিল হওয়ার পর তিনি বলেন, আমিই প্রথম ব্যক্তি যে আমার এক আত্মীয়কে সুদ থেকে বিরত রাখতে হযরত আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব (র)-এর নিকট যেতে হয়েছিল।

ইসলামপূর্ব আরব সমাজে দুই ধরনের ব্যবসা প্রচলিত ছিল। এক প্রকার হলো– মুদারাবা পদ্ধতি। পদ্ধতি হলো, একজন লোক অন্য একজনকে অর্থ বা যে কোনো কিছু ঋণ দিবে (মুদারিবকে) ব্যবসা করার জন্য যে ব্যবসা পরিচালনা করবে এবং যে লাভ অর্জন হবে তা বা ব্যবসায়ী যে লাভ অর্জন করবে তা ঋণদাতা এবং ব্যবসায়ীর মধ্যে ভাগ হবে বা বণ্টন হবে। দ্বিতীয় প্রকার ব্যবসা হলো, একজন অন্য একজনকে অর্থ ঋণ দিবে এবং ঋণ দাতা ঋণ গ্রহীতার নিকট থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ হারে সুদ আদায় করবে। যখন এ মুসলমানরা বলে যে, কুরআন যে রিবা নিষিদ্ধ করেছে তা রিবা ইসতিলাক, যা মানুষের মৌলিক চাহিদার ওপর ধার্য করা হয় যেমন, খাদ্য ক্রয়ের জন্য, পোযাক ক্রয়ের জন্য, এরকম মৌলিক প্রয়োজন। এ ধরনের রিবা নিষিদ্ধ। যখন সূরা বাকারার ২৭৮ নং আয়াত নাযিল হলো, যেখানে বলা হয়েছে–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

অর্থ : "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যে সব বকেয়া আছে তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা মুমীন হয়ে থাকো।"

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর হযরত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমত হযরত আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা) যিনি গরীবদেরকে তাদের মৌলিক অভাব মেটানোর জন্য ঋণ দিতেন এবং তাদের নিকট থেকে সুদ আদায় করতেন। যেমনটি ইহুদিরা করতো। তিনি ব্যবসায়ীদেরকে ব্যবসা করার জন্য ঋণ দিতেন এবং এ ঋণের ওপর নির্দিষ্ট হারে সুদ আদায় করতেন। এ দুই আয়াত নাজিল হওয়ার পর যে পরিমাণ সুদ তাদের আত্মীয়দের নিকট বকেয়া ছিল তা মওকুফ করে দিল। এবং তখন সকল মুসলিম যারা সুদের সাথে সম্পৃক্ত ছিল তাদের যে পরিমাণ সুদী অর্থ বকেয়া ছিল তা মওকুফ করে দিতে হয়েছিল।

চিন্তা করুন, কুরআন মদকেও নিষিদ্ধ করেছে, জুয়াকেও নিষিদ্ধ করেছে। কিন্তু এমন কোনো শব্দ ব্যবহার করেন নি যে, তোমরা যদি মদপান কর, জুয়া খেলো তা হলে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন। তোমরা কেউ তোমাদের ইচ্ছেকে চরিতার্থ করো না, যদি তোমরা তোমাদের ইচ্ছেকে চরিতার্থ কর, বাসনা পূরণ কর তাহলে তোমরা আল্লাহ এবং রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে, এমন কথা কুরআনে বলা হয় নি। কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে কুরআন বলেছে যে, যদি তোমরা সুদের সাথে জড়িত হও অথবা তোমরা যদি নিজেদেরকে সুদের সাথে সম্পৃক্ত কর তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো।

আমি আমার কথা শুরু করেছি কুরআনের কতগুলো আয়াত তিলাওয়াতের মধ্য দিয়ে। তাদের মধ্যে রয়েছে সুরা বাকারার ২৭৮ আয়াত নং আয়াতে বলা হয়েছে–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ -

অর্থ : "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে তা পরিত্যাগ কর। যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকো।"

এ আয়াতে হযরত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওপর নাযিল হওয়ার পর তিনি বলেন, আমিই হলাম প্রথম ব্যক্তি যে, প্রথম সুদ ত্যাগ করার জন্য হযরত আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবের নিকট যাই, তাকে এই সুদ মওকুফ করার জন্য।

এ আয়াতের পরের আয়াতেই বলা হয়েছে–

অতঃপর যদি তোমরা পরিত্যাগ না কর তবে আল্লাহ ও তার রাসূলের ﷺ সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও। (সূরা বাকারা, আয়াত ২৭৯)

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ـ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ـ لَاتَظْلِمُوْنَ وَلَاتُظْلَمُوْنَ ـ

অর্থ : "অতঃপর তোমরা যদি পরিত্যাগ না কর তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও। আর যদি তোমরা তওবা করো তাহলে তোমরা তোমাদের মূলধন ফেরত পাবে। তোমরা জুলুম করো না; তোমাদের ওপরও জুলুম করা হবে না।"

চিন্তা করুন, কুরআন মদ নিষিদ্ধের ব্যাপারে উল্লেখ করেছে এবং এটা নিষিদ্ধ করেছে। কিন্তু কুরআন এখানে এ বলে নি যে, তোমরা মদকে প্রশ্রয় দিয়ো না। যদি তোমরা মদকে প্রশ্রয় দাও তা হলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন। কিন্তু সুদের ব্যাপারে আল্লাহ প্রকাশ ও সুনির্দিষ্টভাবে বলেছেন যে, যদি তোমরা সুদের সাথে জড়িত হও তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ কর না আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমাদের বিরুদ্ধে লড়বেন। আমি জানতে চাই, বর্তমান বিশ্বে এমন কোনো মুসলমান আছে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে সুদের চ্যালেঞ্জ দিতে পারে। যদি আপনি আপনাকে সুদের সাথে জড়িত রাখেন তাহলে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধের চ্যারেঞ্জ দিচ্ছেন।

এর পরবর্তী আয়াতে সূরা বাকারা, আয়াত নং ২৮০-তে বলা হয়েছে–

وَاِنْ كَانَ ذُوْعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ـ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ـ

অথ : "যদি খাতক অভাবগ্রস্থ হয়, তবে তাকে সচ্ছলতা না আসা পর্যন্ত সময় দেওয়া উচিৎ। আর যদি ক্ষমা করে দাও, তবে তা খুবই উত্তম, যদি তোমরা উপলব্ধি কর।"

সুদ নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে অনেক হাদীসও রয়েছে, যেমন মুসলিম শরীফে উল্লেখ আছে–

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اٰكِلَ الرِّبٰوا وَمُوْكِلَهُ وَكَاتِبَيْهِ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ ـ

যাবের (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ অভিশাপ দিয়েছেন তাদের প্রতি যারা সুদ খায়, সুদ দেয়, সুদের হিসাব লিখে ও সুদের সাক্ষী দেয়। তিনি বলেছেন, এরা সকলেই সমান অপরাধী। (মুসলিম শরীফ)

আরো বর্ণিত আছে যে–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ حَنْظَةُ دِرْهَمُ رِبًا يَاكُلُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ اَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلاَثِيْنَ زَانِيْةً ـ

আবদুল্লাহ হানতা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি জেনেশুনে সুদের একটি টাকা খায়, সে ছত্রিশবার জেনার চেয়েও বেশি অপরাধ করল।

আর একটি হাদীস হলো–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الرِّبٰوا سَبْعُوْنَ جُزْءً أَيْسَرُهَا اَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ ـ

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল ﷺ বলেছেন, সুদের পাপের সতেরটি অংশ রয়েছে, তার ক্ষুদ্রতম অংশের পরিমাণ হচ্ছে আপনের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া। (ইবনে মাযা, বায়হাকী)

সুরা বাকারার শেষের আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে সুদ নিষিদ্ধ করার জন্য। এ আয়াতগুলো ২৭৫ থেকে ২৮১ নং পর্যন্ত। এরপর মহানবী হযরত মোহাম্মদ ﷺ এর তিরোধানের পর সাধারণ লোকদের শরীয়া'হ-র বাস্তবায়ন সম্পর্কে গভীরভাবে জানার জন্য পর্যাপ্ত সময় ছিল না। এ সম্পর্কে ইবনে কাসীর উল্লেখ করেন যে, হযরত উমর (রা) বলেন, মহানবী ﷺ তিনটি জিনিসকে ছুঁড়ে ফেলেছেন। প্রথমত সুদ অন্য দুটি হলো : খিলাফা এবং কেলালা। অর্থাৎ, তা হলো একজন অসুস্থ ব্যক্তি, যার কোনো ওয়ারিশ নেই তার সম্পদ কীভাবে বণ্টন হবে। এ সম্পর্কে সূরা নিসার ১২নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ـ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَا أَوْدَيْنٍ ـ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ـ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَّلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ـ فَإِنْ كَانُوْا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَا أَوْدَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ـ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ـ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ـ

অর্থ : "স্ত্রীরা যা রেখে যায় তোমাদের জন্য উহার অর্ধেক যদি তাদের কোনো পুত্র সন্তান না থাকে। আর যদি তাদের পুত্র সন্তান থাকে তাহলে তোমরা তাদের ওসীয়ত এবং ঋণ পরিশোধের পর যা অবশিষ্ট থাকবে উহার এক– চতুর্থাংশ পাবে। আর তোমরা যা রেখে যাবে স্ত্রীরা উহার এক-চতুর্থাংশ পাবে, যদি তোমাদের কোনো পুত্র না থাকে। আর যদি তোমাদের কোনো পুত্র সন্তান থাকে তাহলে তারা এক-অষ্টমাংশ পাবে তোমাদের ওসীয়ত এবং ঋণ পরিশোধের পর যা অবশিষ্ট থাকবে উহা হতে। আর কোনো ব্যক্তি যদি 'কালালা'কে উত্তরসূরী বানায় অথবা কোনো মহিলা ভাই বা বোন রেখে মারা যায়, তবে তাদের প্রত্যেকের জন্য এক-ষষ্ঠাংশ। আর যদি সংখ্যা উহার বেশি হয় তবে তারা ওসীয়ত এবং ঋণ পরিপূর্ণভাবে পরিশোধের পর যা অবশিষ্ট থাকবে উহার এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে অংশীদার হবে। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ এবং ধৈর্যশীল।"

কিন্তু কুরআনের উল্লেখ ছাড়াই আপনি হাদীস থেকে পরিষ্কারভাবে জানতে পারবেন, এগুলো বিভিন্ন সহীহ্ হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। আপনি যদি সহীহ্ বুখারীর সুচি থেকে একের পর একটি অধ্যায় পড়তে থাকনে তাহলে সহীহ্, বুখারীর রিবা অধ্যায়ের টিকা গ্রন্থ হতে জানতে পারবেন যে, রিবা দুই প্রকার, 'রিবা নাসিয়া' এ হলো এমন ধরনের ঋণ যা অন্যকে ব্যবসার জন্য দেওয়া হয় এবং নির্দিষ্ট হারে সুদ আদায় করা হয় এ ঋণের ওপর।

অন্য প্রকার সুদ হলো 'রিবা ফাদল'। এটা হলো এক প্রকার মালের পরিবর্তে অন্য ভালো উৎকৃষ্ট মানের বা বেশি পরিমাণ দ্রব্য বিনিময়।

অর্থাৎ খারাপ মালের পরিবর্তে ভালো মাল বা কম মালের পরিবর্তে বেশি পরিমাণ মালের বিনিময়। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বলা হয়েছে, এসব প্রকার রিবা নিষিদ্ধ বা হারাম। সুদ নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে সহীহ্ মুসলিমেও উল্লেখ করা হয়েছে।

খণ্ড নং ৩ অধ্যায় নং ৬২৩, হাদীস নং ৩৮৯৪৫ থেকে ৩৮৯৪৯ পর্যন্ত। এই পাঁচটি হাদীসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সুদ হারাম।

কুরআন কেন সুদমুক্ত অর্থনীতির ব্যাপারে জোর দিলো? এর অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যই বা কী? কুরআন কেন সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থার বিধান জারি করলো? কুরআন কোনো উদ্দেশ্যে সুদ মুক্ত অর্থব্যবস্থার বিধান দিলো? এর জবাব নিম্নরূপ :

প্রথমত যদি অর্থনীতিকে কল্যাণকর করতে হয় তাহলে ইসলামের উদার অর্থনৈতিক জীবন-যাপন পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যশীল হতে হবে।

দ্বিতীয়ত অন্যায় অবিচার দূর করার জন্য।

তৃতীয়ত সম্পদের সুষম বণ্টনের জন্য।

চতুর্থত সামাজিক দিক থেকে ব্যক্তির স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য।

আসুন আমরা প্রথম উদ্দেশ্যটি বিশ্লেষণ করি, এটা হলো ইসলামের আধুনিক উদার জীবনব্যবস্থার সাথে অর্থনৈতিক কল্যাণকামিতা।

কুরআনে সূরা বাকারার ৬৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে−

قَالُوْا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَالَوْنُهَا - قَالَ اِنَّه يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ - فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النّٰظِرِيْنَ -

অর্থ : "তারা বলল, তোমার প্রভুকে বলো তিনি যেন আমাদের উহার (গাভীর) রং বলে দেন। তিনি বললেন, তিনি বলেছেন যে, উহার রং হবে হলুদ বর্ণের। উহার উজ্জ্বল রং দর্শনার্থীদের আনন্দ দেবে।"

অন্যত্র বলা হয়েছে সূরা বাকারা আয়াত নং ১৬০−

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَبَيَّنُوْا فَاُولٰٓئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِم - وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ -

অর্থ : "যারা তওবা করেছে, সৎকর্ম করেছে, সত্যের সাক্ষ্য দিয়েছে এসব লোকদের প্রতি আমি সদয় হব। আর আমি তওবা কবুলকারী ও দয়ালু।"

সূরা জুমার ১০নং আয়াতে আরো বলা হয়েছে–

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ

অর্থ : "অতঃপর নামাজ সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ কর ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।"

এসব আয়াত থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, কুরআন মানুষকে আল্লাহর অনুগত হওয়ার প্রতি উৎসাহিত করছে এবং আল্লাহ্ আমাদের জন্য সেসব ভালো জিনিস দিয়েছেন তা ভোগ করতে। এ বিষয়ে হাদীসেও এসেছে। যা বায়হাকী তে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَلَبُ كَسَبِ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ ـ

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। রাসূল ﷺ বলেছেন, অন্যান্য ফরজের মতো হালাল উপার্জনও একটি ফরজ। (বায়হাকী)

ভিক্ষাবৃত্তিকে ইসলাম নিরুৎসাহিত করেছে। এ বিষয়ে সহীহ্ বুখারীতে এসেছে খণ্ড ২ পৃষ্ঠা নং ১৩৩। এখানে বলা হয়েছে, "উপরের হাত নিচের হাত থেকে উত্তম।" এ সম্পর্কে আরো এসেছে 'ইবনে মাযা'তে। খণ্ড নং ২ পৃষ্ঠা নং ৭৩৩। এখানে বলা হয়েছে যে, নিজের হাতে, "নিজের পরিশ্রমে আয় হলো সর্বোত্তম আয়।"

সুতরাং ইসলাম একজন মানুষকে আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে উৎসাহিত করেছে এবং নিজে স্বাধীনভাবে জীবনযাপনের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছে। এবং ২য় উদ্দেশ্য হলো ইসলামের সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব এবং ন্যায়পরায়ণতা।

পবিত্র কুরআনে সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে, সুরা হুজুরাতের ১৩নং আয়াতে, এ আয়াতে বলা হয়েছে –

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ـ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ـ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ـ

অর্থ : "হে মানব, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে সেই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেজগার, নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সব কিছুর খবর রাখেন।"

সূরা হুজরাতের অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে–

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ

অর্থ : "নিশ্চয়ই মুমীনরা ভাই ভাই। অতএব তোমরা তোমাদের ভ্রাতৃত্বকে বজায় রাখো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।"

এ আয়াত থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, আল্লাহর নিকট সম্ভ্রান্ত হওয়ার, প্রিয় হওয়ার, বিশিষ্ট হওয়ার মাপকাঠি, তা কোনো লিঙ্গ বৈশিষ্ট্য নয়, সম্পদশালী হওয়া নয়, জাতপাত নয়, বর্ণও নয় বরং এটা হলো তাকওয়া, আর তা হলো আল্লাহভীতি। আমরা আরো জানতে পারি যে, যখন প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ ﷺ বিদায় হজ্জের ভাষণ দিচ্ছিলেন তখন তিনি বলেন, "কোনো আরব অনারব থেকে উত্তম নয়, কোনো শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গের চেয়ে উত্তম নয়, বরং তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে তাকওয়াবান, অধিক জ্ঞানী, যার তাকওয়া বেশি সেই উত্তম।" এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের একটি আয়াত উল্লেখ করা যায়– তা হলো সূরা নিসার ১৩৫ নং আয়াত। এ আয়াতে বলা হয়েছে–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ـ

অর্থ : "হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাক, আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্য দান কর, যদিও তা তোমাদের নিজের বা পিতা-মাতার যা আত্মীয়দের বিরুদ্ধে যায়"।

তৃতীয় উদ্দেশ্য হল : সম্পদ ও আয়ের সুষম বণ্টন। ইসলাম আবারও দার্শনিক ও আদর্শিক দিক থেকে সম্পদের গুটি কয়েক ব্যক্তির নিকট সম্পদের পুঞ্জিভূত হওয়াকে

সমর্থন করে না এবং ধনী দরিদ্রের মধ্যে সম্পদের বৈষম্যকে হ্রাস করার জন্য এ বণ্টন ব্যবস্থা। কেননা ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য না কমলে তারা শত্রুতে পরিণত হবে। এ জন্য ইসলাম যে মহৎ ব্যবস্থা রেখেছে তা হলো যাকাত। এটা যেসব মুসলমান নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক তাদের ওপর ফরজ। যে সব মুসলমানের প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ থাকবে তাকে ২.৫% হারে প্রতি চন্দ্র বৎসরে গরিবদেরকে দিয়ে দিতে হবে। এ অর্থ যেসব শ্রেণীর মানুষের মধ্যে দেওয়া হবে তা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে সূরা তাওবার ৬০নং আয়াতে–

إِنَّمَا الصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَٰكِينِ وَالْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ـ

অর্থ : "যাকাত হলো কেবল ফকির, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন, তাদের হক এবং তা দাস মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্থদের জন্যে, আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য– এ হলো আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"

যাকাতের ৮টি খাতের বিবরণ

পবিত্র কোরআনের উপরিউক্ত আয়াতে যাকাত বণ্টন করার জন্য যে ৮টি খাতের উল্লেখ রয়েছে, সেগুলো নিম্নরূপ :

১. **ফকীর :** অর্থাৎ যার কোনো সম্পদ নেই বা থাকলেও খুব সামান্যই আছে।

২. **মিসকিন :** যে ব্যক্তির কাছে ফকির থেকে কিছু বেশি সম্পদ আছে কিন্তু তা তার ভরণপোষণের জন্য যথেষ্ট নয়, তিনিই মিসকীন।

৩. **আমেল বা কর্মচারী :** যাকাত সংগ্রহকারী কর্মচারীদের আমেল বলা হয়। এ ধরনের কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি যাকাত থেকে দেওয়া যাবে।

৪. **মন জয় করার জন্য :** অমুসলিম, নওমুসলিম ও ইসলাম বিরোধিতাকারীদের মন জয় করার জন্য যাকাত ব্যয় করার হয়।

৫. **দাসমুক্তি :** দাসমুক্তির জন্য, বন্দীদের মুক্তির জন্য ও মিথ্যা মামলায় গরীব আসামী মুক্তির জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে।

৬. **ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধ :** ঋণ পরিশোধে অক্ষম, ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধের জন্য যাকাত ব্যয় করা যায়।

৭. আল্লাহর পথে : জিহাদসহ ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সকল ধরনের ব্যয় মেটানোর জন্য যাকাত ব্যয় করা যায়।

৮. মুসাফির : বিদেশে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির সাহায্যে যাকাত ব্যয় করা যায়।

এ ৮টি খাত ব্যতীত যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যায় না। কারণ এগুলো স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাই মসজিদ, মাদরাসা নির্মাণ, রাস্তা-ঘাট বা পুল নির্মাণ, টিউবওয়েল বসানো, খাল খনন, মাহফিল অনুষ্ঠান এবং মুরদা দাফন সংক্রান্ত কাজে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে না।

যাকাতের কিছু শ্রেণিবিভাগ রয়েছে। যাকাত ব্যবস্থার জন্য কিছু শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে। এর কারণ সূরা হাশরের ৭নং আয়াতে এসেছে–

مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۔ كَىْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ ۔ وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۔ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۔ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۔ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۔

অর্থ : "আল্লাহ জনপদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রাসূলকে যা দিয়েছেন, তা আল্লাহর, রাসূলের, তাঁর আত্মীয়-স্বজনের, ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্থদের এবং মুসাফিরদের জন্যে, যাতে ধনৈশ্বর্য কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জিভূত না হয়। রাসূল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।"

যাকাত ব্যবস্থার প্রবর্তন হলো সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন, দারিদ্র্য বিমোচন, যদি প্রত্যেকে এ যাকাত চর্চা করে, যাকাত ব্যবস্থা মেনে চলে তাহলে কোনো মানুষই না খেয়ে, ক্ষুধায় মারা যাবে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক মুসলমানরাই মুসলমান হয়েও যাকাত সঠিকভাবে আদায় করে না। অধিকাংশ মুসলমান সঠিকভাবে যাকাত দেয় না। মুসলিমদের মধ্যে অধিকাংশের প্রত্যেকে যদি সঠিকভাবে যাকাত আদায় করে তাহলে বিশ্বের মুসলমানদের একজনও দারিদ্র্য সীমার নিচে থাকবে না। ইসলাম শিক্ষা দেয় সঠিক কর্মসংস্থানের, যে বেকার তাকে সঠিক কর্মসংস্থানের এবং তার কাজের ন্যায্য মজুরী দেওয়ার জন্য। ইসলাম মৃত্যুর পর ওয়ারিশদের মধ্যে সম্পদের বিভাজনের, বণ্টনের বিধি-বিধান জারি করেছে, যা কুরআনে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, এ সম্পর্কে সূরা নিসার ১১, ১২ এবং ১৭৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِىْ اَوْلاَدِكُمْ ـ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُنْثَيَيْنِ ـ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ـ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَآ اَوْدَيْنٍ ـ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ـ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ط وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهُ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ـ فَاِنْ كَانُوْآ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِى الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَآ اَوْدَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ ـ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ـ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ـ

অর্থ : "আল্লাহ্ তোমাদের সন্তানদের উত্তরাধিকার সম্পর্কে নির্দেশনা দিয়েছেন যে, প্রত্যেক মেয়ে সন্তান ছেলে সন্তানের অর্ধেক পাবে। স্ত্রীরা যা রেখে যায় তোমাদের জন্য উহার অর্ধেক যদি তাদের কোনো পুত্র সন্তান না থাকে। আর যদি তাদের পুত্র সন্তান থাকে তাহলে তোমরা তাদের ওসীয়ত এবং ঋণ পরিশোধের পর যা অবশিষ্ট থাকবে উহার এক-চতুর্থাংশ পাবে। আর তোমরা যা রেখে যাবে স্ত্রীরা উহার এক-চতুর্থাংশ পাবে যদি তোমাদের কোনো পুত্র না থাকে। আর যদি তোমাদের কোনো পুত্র সন্তান থাকে তাহলে তারা এক-অষ্টমাংশ পাবে তোমাদের ওসীয়ত এবং ঋণ পরিশোধের পর যা অবশিষ্ট থাকবে উহা হতে। আর কোনো ব্যক্তি যদি 'কালালা'কে উত্তরসূরী বানায় অথবা কোনো মহিলা ভাই বা বোন রেখে মারা যায় তবে তাদের প্রত্যেকের জন্য এক-ষষ্ঠাংশ। আর যদি সংখ্যা উহার বেশি হয় তবে তারা ওসীয়ত এবং ঋণ পরিপূর্ণভাবে পরিশোধের পর যা অবশিষ্ট থাকবে উহার এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে অংশীদার হবে। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ এবং ধৈর্যশীল।"

কিন্তু কুরআন নির্দিষ্ট করে দিয়েছে তাদের সম্পদ অবশ্যই বণ্টিত হবে তাদের প্রাপ্য অনুযায়ী।

ইসলাম অনুসারে একজন মানুষ স্বাধীনভাবে জন্মগ্রহণ করে, কোনো লোক বা কেউ এমন কি রাষ্ট্রও তার স্বাধীনতাকে রহিত করতে পারে না। কোনো বিষয়েই তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পরে না, প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীন এবং তার স্বাধীনতায় কেউ বাধা দিতে পারে না, যতক্ষণ না সে সমাজের জন্য ক্ষতিকর কোনো কার্যক্রম করে থাকে। কারণ, ইসলামে বৃহৎ কল্যাণ ব্যক্তি স্বাধীনতা ব্যক্তি স্বার্থ থেকে অগ্রাধিকার পায়। কর্ম ও শ্রম উভয় এবং ব্যবসায় লাভ উভয়ই শরীআতে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কৃষক এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে। আপনি যদি ব্যবসা করেন তাহলে বড় লোকসান দিয়ে ছোট ক্ষতি গ্রহণ করবেন অর্থাৎ ছোট ক্ষতির পরিবর্তে বড় ক্ষতি গ্রহণ করবেন না। আপনাদের এমন কেউ আছেন যে, বড় লাভ বিসর্জন দিয়ে ছোট লাভ গ্রহণ করবেন। সংক্ষেপে, সামাজিক কল্যাণের দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলাম ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে।

সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার অনেক মন্দ ফলাফল রয়েছে, যে কারণে কুরআনে সুদকে হারাম করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো ব্যক্তি ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করলো ব্যবসা করার জন্য এবং সে চাইবে এ থেকে ১০০ রুপি লাভ করার জন্য। এবং তাকে সুদ পরিশোধ করতে হবে, তখন তার ধরণা তার উৎপাদন খরচ হলো ১০০ রুপি, এবং সে এ থেকে লাভ করতে চায়। সুতরাং বিক্রয় মূল্যের সাথে উৎপাদন মূল্য যোগ হবে। তাহলে বিক্রয় মূল্যের সাথে Cost price সুদ এর সাথে সুদ যোগ হয়ে বিক্রয়মূল্য বেড়ে যাবে।

সুতরাং বিক্রয়মূল্য হবে ১০০, এবং এ বিক্রয় মূল্য সুদের কারণে বৃদ্ধি পাবে, এবং যদি বিক্রয়মূল্য বৃদ্ধি পায় তাহলে দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পাবে। চাহিদা হ্রাস পাওয়ার কারণে যোগানও কমে যাবে। এভাবে উৎপাদন হ্রাস পাবে, এবং যখন উৎপাদন কমে যাবে তখন বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিবে, দেখা দিবে বেকারত্বের সমস্যা। এভাবে সুদের কারণে সমাজে অনেক অন্যায় অবিচার দেখা দেয়। যেমন, কোনো ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করলে তাহলে সে লাভ করুক বা নাই করুক তাকে অবশ্যই নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদ পরিশোধ করতে হবে। কোনো পরিবারের জন্য কি এমন কোনো দূর্বিপাক আসতে পারে না যেমন বন্যা, এমন ক্ষেত্রেও ঐ ব্যক্তিকে সুদের পরিমাণসহ ঋণ পরিশোধ করা বাধ্যতামূলক। এখানে তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা নেই। ঋণগ্রহীতা লাভ করুক আর লোকসান দিক তাকে অবশ্যই ঋণ সুদসহ পরিশোধ করতে হয়। তাকে অতিরিক্ত কোনো সময় বা সুযোগ দেওয়া হয় না।

অন্যদিকে আধুনিক ব্যাংকের কোনো সামাজিক দায়বদ্ধতা থাকে না শুধু সুদের কারণে। সমাজের কল্যাণ বা অকল্যাণ তাদের বিবেচনার বিষয় নয় বরং তাদের মূল

লক্ষ হলো অধিক লাভ পাওয়া। সামাজিক দায়বদ্ধতা নিয়ে তারা বিনিয়োগ করে না। যেমন : দুজন লোক একই সময়ে ঋণের জন্য আধুনিক ব্যাংকে এলো এবং প্রথমজন বললো, আমি একটি অ্যালকোহল ফ্যাক্টরি করবো এবং এর থেকে ১০০% লাভের সম্ভাবনা আছে, আপনাদেরকে (ব্যাংককে) বেশি লাভ দেওয়া হবে, ২য় ব্যক্তি বললো, আমি স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য ঋণ চাই এ প্রকল্পে লাভ কম। এক্ষেত্রে বেশি লাভ অর্থাৎ ১ম ব্যক্তিকে ঋণ দিবে ২য় ব্যক্তিকে দিবে না। অ্যালকোহল যে সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করে তা বিবেচনার বিষয় নয়, সুদ এভাবে সমাজকে সামনে অগ্রসরের পথে বাঁধা দেয় এবং সমাজকে পশ্চাদগামী করে তোলে।

সুদের অন্য একটা কুপ্রভাব হলো, সুদ সমাজে অলস পুঁজি সৃষ্টি করে। মানুষ চায় নিরাপদে উপার্জন করতে। সুদ যেহেতু নিশ্চিত তাই মানুষ অর্থ লেনদেন না করে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার না করে পুঁজিকে অলস বসিয়ে রাখে, এতে করে অলস পুঁজির সৃষ্টি হয়, যা সামাজিক কল্যাণের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

সুদের আরো একটি কুফল হলো অর্থের গুটিকয়েক ব্যক্তির নিকট সম্পদের পুঞ্জিভূত হওয়া। সুদ সম্পদের অসম বণ্টনকে ত্বরান্বিত করে। আধুনিক ব্যাংকিং পদ্ধতিতে ব্যাংকের ক্লায়েন্টগণ অংশীদার নয়। সুদ শোষণের হাতিয়ার। যার ফলে বর্তমান বিশ্বে সম্পদের একমূখী গতি বেড়েই চলছে। উদাহরণস্বরূপ, ইহুদিদের নিকট বর্তমানে সম্পদের পাহাড় গড়ে ওঠেছে। কারণ, তারা বর্তমানে বিশ্বের এসব প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণকর্তা।

ইসলামী বিধানে উৎপাদনে জড়িত উপকরণ চারটি। প্রথমটি হলো ভূমি, দ্বিতীয়টি শ্রম, তৃতীয়টি হলো মূলধন এবং চতুর্থটি সংগঠন।

আধুনিক মতবাদে ভূমির প্রাপ্য হলো খাজনা বা ভাড়া। ইসলামী বিধানও একই অর্থাৎ ভূমির জন্য খাজনা। দ্বিতীয় উপকরণ শ্রম, শ্রমের প্রাপ্য, আধুনিক মতবাদে মজুরির কথা বলা হয়। একইভাবে ইসলামী বিধানেও শ্রমের জন্য Wage-এর কথা বলা হয়।

উৎপাদনের তৃতীয় উপকরণ হলো মূলধন। আধুনিক মতবাদে মূলধনের ক্ষেত্রে দেওয়া হয় সুদ। কিন্তু ইসলামী বিধানে বলা হয় মূলধনের প্রাপ্য হলো লাভ-লোকসান, বা অংশীদারিত্ব।

উৎপাদনের চতুর্থ উপকরণ হলো সংগঠন। আধুনিক মতবাদে সংগঠককে লাভ লোকসানের অংশীদারিত্ব বহন করতে হয়। ইসলামী বিধান সংগঠকের জন্য লাভ-লোকসানের অংশীদারিত্বের কথা বলে।

চারটি উপকরণের মধ্যে মূল পার্থক্য হলো, তৃতীয় উপকরণ তথা মূলধনের ক্ষেত্রে। আধুনিক মতবাদ বলে, মূলধনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদ ধার্য করার কথা। অন্যথায় ইসলামী বিধান মূলধনের জন্য লাভ-লোকসান অংশীদারিত্বের কথা বলে। আধুনিক মতবাদ এবং ইসলামী বিধানের এটিই হলো মূল পার্থক্য।

ইসলাম মূলধন এবং সংগঠকের মধ্যে কোনো পার্থক্য করে নি। কারণ টাকা পয়সা তথা মূলধন– যা ব্যাংক ধার দেয় তা মূলত ব্যাংকের নয়। এ মূলধনের মালিক মূলত আমানতকারী। সুতরাং আমানতকারী এবং সংগঠক একই। এভাবে ধার করা অর্থই ব্যাংকে আমানত করা হয়। এ অর্থ বা মূলধন অবশ্যই সংগঠকের সাথে সম্পর্কিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, যে কারণে ইসলামী বিধানে সংগঠন এবং মূলধন এবং এটির ভিত্তি হলো লাভ-লোকসান অংশীদারিত্ব।

ইসলামী ব্যাংকিংয়ের পাঁচটি মৌলিক মূলনীতি হলো–

১. প্রথমটি হলো তাওহীদ, তথা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ; আল্লাহর একত্ববাদ।

২. রিসালাত তথা মহানবী (সা)-এর নবুয়তের পদ্ধতি অনুযায়ী সমাজ থেকে বৈষম্য দূর করা।

৩. 'খিলাফা' তথা আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে এবং বিশ্বাস করতে হবে যে আল্লাহ সর্বজ্ঞ তাঁর মতো জ্ঞানী আর কেউ নেই। অর্থাৎ আল্লাহ মহাজ্ঞানী।

৪. 'তাজকিয়াহ'।

৫. Accountiability তথা দায়িত্বশীলতা।

ইসলামী ব্যাংকিং এ পাঁচটি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

ইসলামের ইতিহাসে ঘাটতি ইউনিট এবং উদ্বৃত্ত ইউনিটের সর্বোত্তম দুটি উদাহরণ রয়েছে যা আমরা আপনাদের দিতে পারি।

আসুন আমরা ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতি এবং আধুনিক ব্যাংকিং পদ্ধতি বিশ্লেষণ করি। প্রথমে আমরা প্রথমটি বিশ্লেষণ করবো। কোনো ব্যক্তি সে ব্যক্তিগত একটি চলতি হিসাব খুলতে পারে ইসলামী ব্যাংকে। এটি একটি চলতি হিসাব। এ চলতি হিসাবের নাম 'আল ওয়াদিয়া'। এ আল ওয়াদিয়া হিসাবের বৈশিষ্ট্য হলো আমানতকারী ইসলামী ব্যাংকের স্থায়ী হিসাবের এ হিসাবে টাকা আমানত করবে। ইসলামী ব্যাংক যে টাকা আমানতকারীর নিকট থেকে গ্রহণ করবে, তা আমানতকারীর অনুমতি সাপেক্ষে ব্যবহার করার সুযাগ পাবে। আপনি একজন আমানতকারী এবং আপনি ব্যাংকে অর্থ ব্যবহারের অনুমতি দিলেন এবং ব্যাংক যদি লোকসান দেয় তবে এ

লোকসানের ভার আমানতকারীর ওপর পড়বে না। কিন্তু যদি ব্যাংক লাভ করে তাহলে ব্যাংক আমানতকারীকে লাভের অংশ দিবে না। আমানতকারী টাকা জমা রাখবে শুধু তার অর্থের নিরাপত্তার জন্য, এখানে আমানতকারী লাভ-লোকসানের ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকবে।

সে তার সম্পদের নিরাপত্তার জন্যই অর্থ জমা রাখবে অর্থাৎ আমানত হলো তার নিকট মূখ্য। ইসলামী শরীআত এ বিষয়ে আমাদেরকে বৈধতা দেয় অর্থাৎ আপনি আপনার অর্থ ব্যাংকে আমানত হিসেবে জমা করতে পারেন এবং ব্যবহার করতে পারেন। একইভাবে, একই সময়ে ইসলামী ব্যাংক আপনাকে একটি চেক এবং স্লিপ বুক দিলো। কিন্তু সাধারণত এ চেক বই দিয়ে আপনি আপনার প্রয়োজনমতো অর্থ উত্তোলন করতে পারেন এবং স্লিপ বুক দিয়ে আপনি আপনার প্রয়োজনমতো অর্থ জমা করতে পারেন। যা আপনি আধুনিক ব্যাংকে করে থাকেন। আমরা এখন ২য় প্রকার deposit account-এর কথা বলবো, এটি হলো একটি saving account-এ Saving account-এ আপনি একজন আমানতকারী এবং আপনার প্রধান উদ্দেশ্য হলো আপনার অর্থের নিরাপত্তা। লাভ লোকসানের ব্যাপারে আপনার কোনো মাথাব্যথা নেই। যদি ব্যাংক আপনার অর্থের দ্বারা কোনো লাভ করে তাহলে ঐ লাভের অংশ থেকে কিছু নিতে আপনার আপত্তি নেই। শরিআত বলে আপনি আপনার ব্যবসা থেকে যে লাভ করেন তা থেকে একটি অংশ অন্যকে উপহার বা পুরস্কার হিসেবে দেওয়ার অধিকার আপনার আছে। শরীআতে এ উপহারকে বলা হয় সাদকাহ। সুতরাং ইসলামী ব্যাংকে আপনার জমা টাকা থেকে ইসলামী ব্যাংক লাভ করলে লাভের অংশ থেকে আপনাকে একটি অংশ দিতে পারে। কিন্তু আপনি কোনোক্রমেই নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ দাবি করতে পারেন না। এটা ইসলাম অনুমোদন করে না বা অনুমতি দেয় না। ব্যাংক আপনাকে যে অংশ দিলো তা গ্রহণ করলেন এবং বাকী লভ্যাংশ ব্যাংককে দেয় হিসেবে প্রযোজ্য হবে। আপনার যদি ইচ্ছে হয় তবে আপনার অধিকার আছে এ অর্থ ফেরত দেওয়ার। এটা ইসলামী শরীঅতে বৈধ।

সুতরাং এ account, চলতি হিসাব এবং Saving account এ আমানতকারী প্রধানত তার অর্থের নিরাপত্তার বিষয়ে আগ্রহী থাকে, তারা লাভের ব্যাপারে নয়।

আরো অন্য হিসাব আছে। যেমন Investment account একে আধুনিক ব্যাংকের Fixed deposit account-এর সমতুল্য বলা যায়। ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতিতে আরো বেশ কিছু হিসাব রয়েছে। তা হলো মুরাবাহা-এর অর্থ হলো লাভ-লোকসান অংশীদারিত্ব অর্থাৎ একজন আমানতকারী একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ

নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জমা দেয়। এ নির্দিষ্ট পরিমাণ সময় হতে পারে ৩ মাস বা ৩ মাসের গুণিতক। এমন হতে পারে ৩ মাস, ৬ মাস, ৯ মাস, ২ মাস ইত্যাদি। এ উদাহরণ আপনাদেরকে দেওয়া হলো মালয়েশিয়া ইসলামী ব্যাংকের ওপর ভিত্তি করে। এটিই হলো বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে উত্তম ইসলামী ব্যাংক। শুধু তাই নয় মালয়েশিয়ান ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রেও এটি সেরা।

বিশ্বের অন্য কোনো ইসলামী ব্যাংক কোন্ দিক দিয়ে মালয়েশিয়ার ইসলামী ব্যাংক থেকে উত্তম নয়। অন্যসব দেশের ইসলামী ব্যাংকগুলো আংশিক ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতি অনুসরণ করে আবার আংশিক আধুনিক পদ্ধতি অনুসরণ করে। আমার জানা মতে মালয়েশিয়া একমাত্র দেশ যেখানে ইসলামী ব্যাংকিংয়ে ১০০ ভাগ শরীয়া অনুসরণ করে। আমি আপনাদেরকে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের যে ধারণা বলছি তা মালয়েশিয়ান ইসলামী ব্যাংকিং-এর ওপর ভিত্তি করে।

এ Investment account, যাকে বলা হয় 'মুদারাবাহ্'।

আপনি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ রাখলেন, সময় হতে পারে ৩ মাস, ৬ মাস, ৯ মাস অথবা ১২ মাস অথবা ৩ মাসের যে কোনো গুণিতক, কোনো কোনো ব্যাংক ৪ মাসের গুণিতক হিসাব করে থাকে। এ অর্থ ব্যাংক ব্যবসায়ীর সাথে ব্যবহার করে থাকে। এ অর্থ ব্যবহৃত হয় ব্যাংকের দ্বারাই ব্যবহৃত হয়। ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে। সুতরাং এ একাউন্টে ডিপোসিটর যে অর্থ জমা রাখে এক্ষেত্রে Depositor কে বলা হয় 'সাহেবে মাল' এবং ব্যাংকে বলা হয় 'সাহেবে আমল'। আপনি হলেন উদ্বৃত্ত ইউনিট। Depositor হলেন Surplus unit এবং (I.B) ব্যাংক হলো deficite unit। ইসলামী ব্যাংক যে পরিমাণ লাভ করুক না কেন তা পূর্ব নির্ধারিত অনুপাতে বণ্টন হবে। ইসলামী ব্যাংক নির্দিষ্ট সময়ে যে পরিমাণ লাভ করবে তা ইসলামী ব্যাংক এবং Depositor এর মধ্যে পূর্ব নির্ধারিত অনুপাতে বণ্টন হবে। মালয়েশিয়ার ইসলামী ব্যাংকে এ অনুপাত হলো ৭ ভাগ এবং ৩ ভাগ। ৭ ভাগ লাভ দেওয়া হয় Depositor-কে ৩ ভাগ লভ্যাংশ দেওয়া হয় Bank-কে, অর্থাৎ ৭০% লভ্যাংশ পায় Depositor এবং ৩০% লভ্যাংশ পাবে ব্যাংক।

উদাহরণ স্বরূপ, যদি আপনি মালয়েশিয়ার ইসলামী ব্যাংকে এক বছরের জন্য ১,০০০ টাকা আমানত রাখলেন এবং ব্যাংক ১০০ টাকা লাভ করলো, সুতরাং ব্যাংক আপনাকে ৭০ টাকা দিবে এবং ব্যাংক লাভের বাকী ৩০ টাকা রাখবে। কিন্তু সাধারণত আপনি আপনার মূলধন ফেরত পাবেন। লাভ ৭০% হলে আপনি পাবেন ৭০ টাকা ব্যাংক রাখবে ৩০ টকা। আর যদি ব্যাংক ৩০০ টাকা লাভ করে তখন

ব্যাংক ৩০% লভ্যাংশ তথা ৯০ টাকা রাখবে আপনাকে ৭০% লভ্যাংশ অর্থাৎ ২১০ টাকা। সুতরাং লাভের পরিমাণ যত বেশি হবে আমানতকারীর লভ্যাংশ তত বেশি হবে এবং ব্যাংকের লভ্যাংশ তত বেশি হবে। একইভাবে লাভের পরিমাণ যত কম হবে আমানতকারী এবং ব্যাংকের লভ্যাংশ তত কম হবে।

এ হলো লাভের বণ্টন এবং যদি লাভ হয় শুন্য অন্য কথায় কোনো লাভ না হয় তাহলে ব্যাংক এবং আমানতকারী উভয়ই কোনো লাভ পাবে না তথা ০০ লাভ পাবে। কিন্তু, মনে করুন এমন একটি পরিস্থিতি যে, ব্যাংক লোকসান দিলো– তাহলে মুদারাবা পদ্ধতিতে এ লোকসান বহন করবে শুধু Depositor।

এ ব্যবসার লোকসান কেবল Depositorই বহন করবে। উদাহরণস্বরূপ, ধরুন, আপনি ১,০০০ টাকা বিনিয়োগ করলেন ১ বছর মেয়াদি এবং ১০০ টাকা লোকসান হলো তাহলে আপনার উপরই ১০০ টাকা লোকসান বর্তাবে এবং সেজন্য আপনি আপনার মূলধন তথা ৯০০ টাকা ফেরত পাবেন। এ ১০০ টাকা লোকসান হিসেবে কর্তন করা হবে। অর্থাৎ এ লোকসান কেবল আমানতকারীই বহন করবে। কিন্তু বাস্তবে যেহেতু ইসলামী ব্যাংকও লোকসানের সম্মুখীন হলো। কারণ সাধারণভাবে তাদের অফিস স্টাফদের বেতন দেওয়া এবং তাদের পরিচালন ব্যয় আছে কিন্তু এগুলো ধরা হয় না। কিন্তু বাস্তবিকভাবে এ ব্যাংক Cost free চলে না।

সুতরাং ব্যাংক নিজেও এ লোকসানের ভাগীদার হয়। যদিও তা আমানতকারীর সাথে তুলনামুলকভাবে শতকরা হিসেবে কম। এটাই হলো পদ্ধতি। এখন আমরা ইসলামী ব্যাংকের একটি বিনিয়োগ প্রকল্প দেখবো। মনে করুন, একজন ব্যবসায়ী সে ইসলামী ব্যাংক থেকে Loan নিতে চায়। সে ইসলামী ব্যাংকে গেল এবং বললো, আমার প্রকল্পের জন্য অর্থ চাই। তার জন্য প্রথম পদ্ধতি হলো মুদারাবা পদ্ধতি। তা হলো, ঐ ব্যবসায়ী ইসলামী ব্যাংকে যাবে এবং বলবে, আমার একটি ৬ মাসের প্রকল্প আছে এবং এর জন্য আমার ৫ লাখ টাকা দরকার। আমি ৬ মাস পর এ প্রকল্প থেকে ১ লাখ টাকা লাভ পাবো। এ প্রকল্প থেকে ৬ মাস পর ১ লাখ টাকা লাভ পাওয়া যাবে। তাহলে ইসলামী ব্যাংক কি ব্যবসায়ীকে ১ লাখ টাকা ৬ মাসের জন্য দিবে? কিন্তু সাধারণভাবে ইসলামী ব্যাংক যা করবে তা হলো, তারা প্রথমে ব্যবসাটা কী এবং ব্যবসাটি বিশ্বাসযোগ্য কিনা, তা লাভজনক হবে কিনা তা বিশ্লেষণ করে দেখবে। যদি তাদের বিশ্লেষণ ইতিবাচক হয় তাহলে তখন ইসলামী ব্যাংক এবং ব্যবসায়ী এক টেবিলে বসবে এবং লাভের অংশীদারিত্বের অনুপাত চূড়ান্ত করবে। অর্থাৎ তারা তাদের ব্যাংক এবং ব্যবসায়ীর লাভের অনুপাত কী হবে তা চূড়ান্ত করবে। উদাহরণস্বরূপ, ইসলামী ব্যাংক বললো, আপনার প্রকল্প থেকে যে

লাভ হবে তার ৩ ভাগ পাবে ইসলামী ব্যাংক এবং ২ ভাগ পাবেন আপনি (ব্যবসায়ী) অর্থাৎ উদ্যোক্তা যে লাভ করবে তার ৬০ ভাগ পাবে ইসলামী ব্যাংক এবং বাকী ৪০ ভাগ পাবে উদ্যোক্তা। এটি তারা দরকষাকষির মাধ্যমে নির্ধারণ করতে পারে। (লাভের অনুপাত)

আধুনিক ব্যাংকিং পদ্ধতিতে সুদের হারের ক্ষেত্রে দরকষাকষি চলে। ইসলামী ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে লাভের অনুপাতের ক্ষেত্রে দরকষাকষি চলে। সুতরাং ব্যবসায়ী তখন বললো যে, আমার ৬ মাস মেয়াদী ব্যবসার জন্য ৫০ হাজার টাকা প্রয়োজন। এ ৫০ হাজার টাকা তার ব্যবসার জন্য ব্যবহৃত হলো তথা ব্যবসায় কাজ করলো এবং এর সাথে তার বেতনও একীভূত হবে। যদি সে নিজে কাজ না করে। যদি অন্য কোন লোক নিয়োগ করে তাহলে তার বেতন যোগ হবে না। কিন্তু সে যদি কাজ করে, উদাহরণস্বরূপ অন্য লোক কাজ করলো ২,০০০ টাকায় মাস প্রতি তাহলে সে ২,০০০ টাকা মাস প্রতি পাবে ঐ ৫০ হাজার টাকা থেকে। ৬ মাসের জন্য সে ১২ হাজার (৬ × ২,০০০) টাকা পাবে। সে ৬ মাস শেষে ১২ হাজার টাকা পাবে এবং এ ১২ হাজার হিসাবে ধরা হবে এবং বাকী ৩৮ হাজার টাকা ব্যবসার মাল ক্রয় করতে এবং আনুষঙ্গিক ব্যয় হিসাবে ব্যবহৃত হবে। বেতন হিসেবে ধরা হবে (৫০ হাজার টাকা হতে) তবুও সে (উদ্যোক্তা) ৫০ হাজার টাকা লাভ করবে। সে ফেরত পাবে ১ লাভ টাকা। কিন্তু সাধারণভাবে সে মূলধনের ৫ হাজার টাকা ব্যাংককে ফেরত দিবে। এবং বাকী ৫০ হাজার টাকা লাভের অংশ পূর্ব নির্ধারিত অনুপাত হিসেবে বণ্টন হবে। ইসলামী ব্যাংক নিবে ৬০ ভাগ, ৩৩ হাজার টাকা এবং ব্যবসায়ী নিবে ৪০ ভাগ, ১৩ হাজার টাকা। ৬ মাস শেষে ব্যবসায়ী পাবে ২০ হাজার লাভ এবং ১২ হাজার টাকা তার পরিশ্রমিক হিসেবে যদি লাভ হয়।

যদি ব্যবসায়ী ৪০ হাজার টাকা লাভ করে তাহলে সে ব্যাংককে দিবে ৬০ ভাগ ২৪ হাজার টাকা এবং যদি ব্যবসায়ী যদি ৬০ হাজার টাকার লাভ করে তাহলে ব্যাংকে জমা দিবে ৬০ ভাগ, ৩৬ হাজার টাকা এবং ব্যবসায়ী রাখবে ৬০ ভাগ, ২৪ হাজার টাকা, লাভের পরিমাণ যত বেশি হবে ব্যাংক এবং ব্যবসায়ীর অংশ ও তত বেশি হবে। এবং লাভের পরিমাণ যত কম হবে তাদের লাভের অংশও তত কম হবে। কিন্তু যদি ব্যবসায়ী লোকসান দেয় তাহলে, পুরোপুরি লোকসান। সবটুকু লোকসান ইসলামী ব্যাংক বহন করবে এবং প্রকৃতপক্ষে ব্যাংক এ লোকসান আমানতকারীদের ওপর চাপাবে। কিন্তু মুদারাবা পদ্ধতির মৌলিক পার্থক্য হলো, ব্যাংকের কোনো সেবিকার নেই যে, তা ব্যবসায়ী। উদ্যোক্তার ব্যবসা পরিচালনা Interfere করে। ব্যাংক প্রতি সপ্তাহে, প্রতি মাসের জবাবদিহিতা নিতে পারে এতে কোনো সমস্যা

নেই, কিন্তু ব্যবসা কীভাবে চলবে সে ব্যাপারে ব্যাংক Interfere করতে পারবে না। ধরুন, ব্যবসায়ী ১০ তলা একটি বিল্ডিং তৈরি করতে চায় সুতরাং ব্যাংক তাকে বলতে পারবে না যে, আরো ২ তলা বেশি বানাও এবং ব্যাংক এটাও বলতে পারবে না যে, তুমি যদি B গ্রেডের পরিবর্তে A গ্রেড সিমেন্ট ব্যবহার কর তাহলে কোনো লাভ হবে না। মুদারাবা পদ্ধতিতে ব্যাংক ব্যবসায়ীর ব্যবসার ব্যাপস্থাপনার বিষয়ে কোনোই Interfere করতে পাবে না।

দ্বিতীয় প্রকার পদ্ধতি হলো, 'মুশারাকা" পদ্ধতি। একে অংশীদারী কারবার বলা হয়। এ পদ্ধতিতে ব্যবসার ব্যবস্থাপনাকে Interfere করার অধিকার থাকে। এখানে ব্যাংক দিকনির্দেশনা দিতে পারে এবং বলতে পারে যে, এটি একটি নির্দিষ্ট ধারা তৈরি করতে চায় যা নির্দিষ্ট ধারা তৈরি করতে চায় না, ১০ তলা বিল্ডিংকে ১২ তলা বিল্ডিংয়ে রূপান্তর করা হবে। মুসারাকা সিস্টেমে ব্যবসা হলো মূলধনের একটি অংশ এবং এ মূলধন ব্যাংক থেকে গ্রহণ করা হয়। এ মূলধন ব্যাংক থেকে গ্রহণ করা হয় বিনিয়োগ হার হিসেবে গ্রহণ করা হয়। যেমন ধরুন, উভয় ৫০% হিসেবে মূলধন দিলো, ব্যবসায়ী দিলো ৫০% এবং ব্যাংক দিলো ৫০%। কিন্তু যে ব্যবসা থেকে যে লাভ অর্জন হবে তা পূর্ব নির্ধারিত অনুপাত হিসেবে উভয়ের মধ্যে বণ্টন হবে। উদাহরণস্বরূপ, এটা হতে পারে, ৫০%, ৫০% যে লাভ হবে তার ৫০% যাবে ব্যাংকে এবং বাকী ৫০% পাবে ব্যবসায়ী। এবং যদি লোকসান তাহলে লোকসানও উভয়ের মধ্যে বণ্টন হবে, উভয়েই বহন করবে, পূর্ব নির্ধারিত অনুপাত হিসেবে। মুদারাবা পদ্ধতিতে লোকসানের পুরোটাই ব্যাংক বহন করে কিন্তু মুসারাকা পদ্ধতিতে লোকসানের অংশ পূর্ব নির্ধারিত হার। অনুপাত অনযায়ী উভয়ই বহন করে, এক্ষেত্রে লোকসানের অনুপাত বণ্টন লাভের অনুপাত বণ্টন থেকে পৃথক। যেমন : লাভের অনুপাত অর্ধেক অর্ধেক বা ৫০% এবং ৫০% কিন্তু লাভের অনুপাত ব্যাংকের জন্য ৬০% এবং ব্যবসায়ীর জন্য ৪০%। লোকসানের ক্ষেত্রে লাভের বেশি অংশ বহন করে। ধরুন, ব্যাংক লোকসান দিলো তাহলে ব্যাংক লোকসানের ৬০% বহন করবে এবং ব্যবসায়ী ৪০% বহন করবে, এটা হলো মুদারাকা পদ্ধতি।

তৃতীয় পদ্ধতি হলো, মুরাবাহা পদ্ধতি। এর উদাহরণ হলো, ধরুন আপনি নির্দিষ্ট কোনো প্রকার যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে চান ব্যাংক থেকে। এ যন্ত্রপাতির দাম ১ লাখ টাকা। আধুনিক ব্যাংক হলো আপনাকে এতে একটি এলসি বা লেটার অভ্ ক্রেডিট অথবা TR Cost recipt খুলতে হবে। আপনি ব্যাংকে এ পরিমাণ অর্থাৎ ১ লাখ টাকা অর্থ জমা রাখবেন এবং ব্যাংক এটি ক্রয় করবেন এ আধুনিক ব্যাংক থেকে। এ লেনদেনের ক্ষেত্রে যে সময় লাগবে তার জন্য ব্যাংক আপনার ওপর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদ আদায় করবে।

প্রশ্নোত্তর পর্ব

প্রশ্ন : ডা. জাকির নায়েক আপনি যে মেয়াদ উল্লেখ করেছেন সে সম্পর্কে আমি আপনার কাছে জিজ্ঞেস করতে চাই। ধরুন, ২ বছর মেয়াদের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করা হলো এবং উদ্যোক্তা এ সময়ের মধ্যে কোনো লাভ অর্জন করতে ব্যর্থ হলো এবং কোনো লোকসানও দিলো না এবং সময় নিলো। সুতরাং ব্যাংক কি এ অর্থ ফেরত দিতে বাধ্য হবে না কি?

উত্তর : ধরুন, এ ব্যাংক হলো ইসলামী ব্যাংক। এ ইসলামী ব্যাংক একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ২ বছর মেয়াদে বিনিয়োগ করলো এবং ব্যবসায়ী কোনো প্রকার লাভ অর্জন করতে ব্যর্থ হলো লোকসানও দিলো না। তাহলে এক্ষেত্রে ব্যাংক বিনিয়োগের অর্থ ফেরত নিবে কি নিবে না তা শর্ত নির্দিষ্ট থাকে যে, ২ বছরের জন্য অর্থ নেওয়া হবে ব্যাংক থেকে তাহলে ইসলামী ব্যাংকে অধিকার আছে যে, এ অর্থ ফেরত নেওয়া। লোকসান হোক কিংবা লাভ হোক। এক্ষেত্রে লাভ-লোকসান বিষয় নয়। কিন্তু যদি ব্যাংক মনে করে ব্যবসায়ীকে আরো ৬ মাস সময় দেওয়া হবে তাহলে ব্যবসায়ী হয়তো লাভ অর্জন করতে পারবে তাহলে ব্যাংক সময় $\frac{১}{২}$ বছর কিংবা ২ বছর বাড়াতে পারে তবে তা নির্ভর করে ব্যবসা কতটুকু লাভজনক। এটা সম্পূর্ণ ব্যাংকের সিদ্ধান্তের ব্যাপার। আর লোকসান বহনের মৌলিক পার্থক্য হলো, ব্যবসা যদি মুদারাবা সিস্টেমে হয় তাহলে ব্যবসায়ী সরাসরি লোকসান বহন করবে না, লোকসান ব্যাংক বহন করবে।

প্রশ্ন : আমার প্রশ্ন ব্যাংকের জনগণকে যে হাউজিং লোন দেয় সে সম্পর্কিত। অনুগ্রহ করে আপনি কি বলবেন ইসলামী বিধানে ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতিতে এ লোন কীভাবে হতে পারে– যা জনগণের বাসস্থান নির্মাণে সাহায্য করতে পারে?

উত্তর : ধরুন, একজন ব্যক্তি একটি বাড়ি কিনতে চায় এবং এজন্য ঋণ নিতে চায়। একটি আধুনিক ব্যাংকের আমানত গ্রহণ, ঋণদান এ হাউজিং এর ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকের তুলনা কী হবে। আধুনিক ব্যাংকের আসল পার্থক্য হলো ধরুন, মনে করুন, আপনি একটি বাড়ি কেনার জন্য হাউজিং লোন চান, কিন্তু সাধারণত এর জন্য আপনার নিজস্ব একটা হারে অর্থ অবশ্যই থাকতে হবে। এটা হতে পারে ১৫%

অথবা ৫০%। ব্যাংক হারে যাহোক যা আপনাকে অবশ্যই দিতে হবে তা হতে পারে ২৫% অথবা ৩০% অথবা ৫০%। এ পরিমাণ অর্থ আপনি দেওয়ার পর বাকি ৭৫% বা ৫০% বা ২৫% পরিমাণ অর্থ ব্যাংক দিবে। মনে করুন, এ বাড়ির দাম ৩-৪ লাখ টাকা। প্রথমত আপনি দিলেন ১ লাখ টাকা এবং বাকী ৩ লাখ টাকা দিবে ব্যাংক এবং ব্যাংক আপনাকে বললো আপনি ৩ বছর সময় পাবেন এ অর্থ পরিশোধ করার জন্য। যে ৩ লাখ টাকা আধুনিক ব্যাংক থেকে নেওয়া হলো তাতে ৩ বছরের সুদের হার ধরা হলো তা হলে কতটুকু পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে হবে তা হতে পারে ৪০ হাজার টাকা অথবা ৫০ হাজার টাকা। সুতরাং হিসাব করা হবে আপনাকে দেওয়া প্রাথমিক লোন (৩ লাখ) যোগ হবে সুদ। সুতরাং ৫০ হাজার সুদ হলো সুদ। এ ৩ রাখ ৫০ হাজার টাকা ৩ বছর মেয়াদ পরিশোধ করতে হবে। এ হারে ৫০ হাজার টাকা মাসের সংখ্যা দ্বারা এটা হবে মাসিক প্রায় ১০ হাজার টাকা। এটা হলো মাসিক কিস্তি। তাহলে আপনাকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদ দিতে হচ্ছে। এটা হলো আধুনিক ব্যাংকের পদ্ধতি। আধুনিক ব্যাংকের পদ্ধতি হলো সুদভিত্তিক। আপনি যে কিস্তি দিলেন তা আপনাকে দেওয়া লোনের সাথে সুদ যোগ হয়ে পরিশোধ হলো। কিন্তু এটা হলো সুদ এটা ইসলামে হারাম।

ইসলামী ব্যাংকের পদ্ধতিতে অনেক পার্থক্য আছে। আপনি ইসলামী ব্যাংক থেকে যে লোন নিবেন তা নেওয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি বা উপায় আছে। বিভিন্ন ব্যাংকের বিভিন্ন প্রকল্প আছে। মনে করুন, আপনি ৪ লাখ টাকার একটি ফ্লাটের ২৫% বা ৩০% বা ৪০% বা ৫০% প্রথমেই দিলেন। আপনি যদি ১ লাখ টাকা দেন তাহলে ব্যাংক দিবে ৩ লাখ টাকা। এখন ইসলামী ব্যাংক হিসেব করবে এ ফ্লাটের গড় মাসিক ভাড়া কত হবে। এটা হতে পারে মাসিক প্রায় ১৫ হাজার টাকা। যেহেতু আপনি প্রথমেই ১ লাখ বা ২৫% নিজে দিয়েছেন এবং বাকি ৭৫% ব্যাংক দিয়েছে, সুতরাং ২৫% আপনাকে দিতে হবে না, বরং বাকি ৭৫% আপনাকে দিতে হবে এবং ৭৫% ভাগ হিসেবে ভাগ হবে। তাহলে মাসিক ভাড়া কত দাঁড়াবে? যেহেতু ইসলামী ব্যাংক ৭৫% বিনিয়োগ করেছে এবং ২৫% আপনি বিনিয়োগ করেছেন।

সুতরাং আপনি ভাড়া হিসেবে করবেন এবং ৩ বছর শেষে অবস্থা দাঁড়াবে এমন যে, ইসলামী ব্যাংক বললো সে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ নিবে। তা হতে পারে ৩০ হাজার বা ৪৫ হাজার টাকা। সুতরাং ৩০ হাজার টাকা ৩ লাখের সাথে যোগ হবে। ৩.৩ লাখ টাকা ৩৬ মাস দ্বারা ভাগ করলে যা হবে তা মাসিক কিস্তি বা ভাড়া হবে। এখানে এটাকে সুদ হিসেবে গণনা করা হচ্ছে না বরং তা লাভের ওপর লাভ হিসেবে গণনা করা হচ্ছে। আপনি প্রতি মাসে ঐ বাড়ির জন্য ভাড়া দিচ্ছেন এটা হলো লোন

নেওয়ার একটি উপায়। উদাহরণ স্বরূপ, ধরুন আপনি আলামিন ব্যাংকে গেলেন, তাদের একটা আবাসন প্রকল্প আছে। যেখানে ব্যাংক আপনাকে বললো, আপনাকে এখন থেকেই সঞ্চয়ের প্রতি উৎসাহিত করলো। আপনি প্রতি মাসে ১,০০০ টাকা বা ২ হাজার টাকা বা ৩ হাজার টাকা জমা করলেন। এ জমা পরবর্তীতে আসিয়ান স্কিমে পরিবর্তিত হলো। এ বিনিয়োগ মুদারাবা পদ্ধতিতে যোগ হলো। আপনি এখান থেকে লাভ পেলেন ফলে ৩ বছর পর প্রতি মাসে ৩,০০০ টাকা জমার টাকা দাঁড়াবে ৩,০০০ × ৩৬ =১,০৮,০০০ টাকা। এ ১ লাখ ৮ হাজার এবং লাভ যোগ হয়ে এ পরিমাণ হতে পারে মোট ১ লাখ ৫০ হাজার বাকি যা থাকবে তা আপনাকে দিবে আলামিন ব্যাংক। এ টাকা ভাড়ার ওপর ভিত্তি করে দেওয়া হবে, এটা সুদ নয়। এটা লাভ। সুতরাং যাই কিছু সুদ ভিত্তিক তা হারাম বরং যা লাভ লোকসানের ভিত্তিতে হয় তা হালাল, বৈধ।

প্রশ্ন : ধরুন, আপনার নিকট সুদ থেকে পাওয়া অর্থ আছে। কেউ কেউ বলেন, আপনি এ অর্থ দিয়ে টয়লেট, বাথরুম তৈরি করতে পারি, এটা কি ঠিক?

উত্তর : আপনার প্রশ্ন হলো যে, আপনার নিকট সুদ থেকে প্রাপ্ত অর্থ আছে, কেউ কেউ বলেন যে, এ অর্থ দিয়ে টয়লেট বাথরুম বানানো যাবে, আসলেই এটা করা যাবে কিনা?

প্রথমত আপনি একজন মুসলিম, আপনি একজন মুসলিম হিসেবে কোনো ভাবেই সুদের সাথে জড়িত হতে পারেন না। সুতরাং আপনি যদি সুদের সাথে জড়িত না হন, তাহলে তো কেউ এ প্রশ্ন উত্থাপন করবেই না। মনে করুন, আপনি কোনো সুদের সাথে জড়িত কোনো Institute বা সুদ ভিত্তিক ব্যাংককে টাকা জমা রাখলেন না। তাহলে আপনি যদি সুদী প্রতিষ্ঠানে অর্থ না রাখেন তাহলে তো তারা আপনাকে সুদ দিবেই না। তাহলে তো এ প্রশ্ন উঠবেই না। মনে করুন, আপনি আজই জানলেন যে, সুদ হারাম এবং সিদ্ধান্ত নিলেন যে আপনি এখন থেকে সুদ বিরত থাকবেন। যদি কোনো মানুষকে তওবা করতে হয় তাহলে তাকে তিনটি বিষয় করতে হয়। প্রথমত তাকে বুঝতে হবে যে, এ বিষয়টি বা কাজটি করা হারাম। এটা নিষেধ, দ্বিতীয়ত তাকে তৎক্ষণাৎ তা করা থেকে বিরত হতে হবে এবং তৃতীয়ত তাকে ভবিষ্যতে সে কাজ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

তখন আপনি যদি মনে করেন যে, আপনার নিকট যদি কোনো সুদী অর্থ জমা থাকে তাহলে আপনাকে বলা হবে, আপনি এগুলো আল্লাহর পথে ব্যয় করেন। কিন্তু

আপনি যদি বলেন যে, কোনো সুদভিত্তিক ব্যাংকে আপনার Fixed deposite এবং Current একাউন্টে আছে এবং এ ব্যাংক থেকে প্রতি বছর নিয়মিত যে অর্থ পান তা দিয়ে আপনি টয়লেট বানাতে চান। এ আপনি বাথরুম, টয়লেট তৈরির মাধ্যমে খরচ করবেন, কেউ কেউ যদি বলে থাকে আপনি এগুলো তৈরিতে ব্যয় করতে পারেন কিন্তু তারা এ কথা কোথা হতে পেল তা আমি জানি না। আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই। ধরুন, কোনো একজন ব্যক্তি মাদকের ব্যবসা করে। তা কোকেনের বা হেরোইনের ব্যবসা হতে পারে। সে বললো, আমি মাদকের ব্যবসাতে ১ লাখ টাকা বিনিয়োগ করেছি এবং আমার এ টাকা বিনয়োগ থেকে প্রতিমাসে ১ লাখ টাকা লাভ পাই। যেহেতু মাদক হারাম, সেহেতু এ ব্যবসায়েই ১ লাথ টাকার এক পয়সাও নিব না, আমি এ লাখ টাকা গরীব লোকদের জন্য ব্যয় করবো। আপনি কি মনে করেন এটা ইসলামে বৈধ? সাধারণভাবে এটা ইসলামে বৈধ না। কিন্তু যেহেতু মাদক যেমন ইসলামে হারাম তাই মাদকের ব্যাখ্যাও ইসলামে হারাম, আপনি বলতে পারেন ক্ষতিপূরণ হিসেবে আমি মাদক ব্যবসা থেকে প্রাপ্ত অর্থ ভালো কাজে ব্যবহার করবো। এটা বৈধ নয়। একইভাবে আপনার অর্থ যদি কোনো সুদী ব্যাংকে Fixed deposit করেন এবং তা হতে প্রাপ্ত সুদ দ্বারাই আপনি গ্রামে বাথরুম, টয়লেট তৈরি করে দেন, আপনি বললেন যে, আমি ১ লাখ টাকা দিয়ে প্রত্যেক গ্রামে টয়লেট তৈরি করে দিবেন।

আপনি কি মনে করেন এটা বৈধ। যে হয়তো ব্যাখ্যা করে মাদকের ব্যবসা এবং সে কোটি কোটি টাকা মূল্যের হাজার হাজার জীবন ধ্বংস করে লাখ লাখ টাকা অর্জন করলো। এক্ষেত্রে ১ লাখ টাকা অতি তুচ্ছ। সুতরাং আপনি ১ লাখ টাকা দিয়ে বাথরুম তৈরি করে সামান্য ক্ষতি পূরণ করতে পারেন না। সুদ হারাম। সুতরাং আপনি সুদী প্রতিষ্ঠানে আপনার অর্থ না রাখলেই পারেন। সুতরাং তখন সুদী অর্থ ব্যয় করার প্রশ্নই ওঠে না। আপনাকে আজই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, সুদ হারাম এবং আপনার যে কোনো ধরনের আয় হবে তা আল্লাহর পথে ব্যয় করবেন। আল্লাহ নিশ্চয়ই তা কবুল করবেন।

প্রশ্ন : জাকির ভাই, আপনি কোরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, সুদ নেওয়া হারাম। সুদ দেওয়াও কি হারাম?

উত্তর : আপনি একমত যে, সুদ গ্রহণ হারাম। আপনার প্রশ্ন হলো সুদ দেওয়াও কি হারাম? সুদ ও জুয়া সম্পর্কে সূরা মায়েদার ৯০ নং আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে—

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ

অর্থ : "হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তি ও শুভ-অশুভ নির্ধারণের তীর অপবিত্র শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা থেকে বিরত থাক যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।"

যেহেতু কুরআন মাদক নিষিদ্ধ করেছে ঠিক আছে, তাহলে আমি যদি বলি, মাদক সেবন তো হারাম, তাহলে মাদক বিক্রি কি বৈধ হবে? সাধারণত যেহেতু মাদক কুরআন নিষিদ্ধ করেছে, তাই মাদক বিষয়ক সকল কারবার হারাম। এ বিষয়ে হাদীসে বিস্তারিত এসেছে। উদাহরণস্বরূপ, হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত একটি হাদীস। এ হাদীসে হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ১০ প্রকার মানুষকে আল্লাহর অভিশাপ করেছেন। এ দশ প্রকার মানুষ অভিশপ্ত। তাদের মধ্যে সুদের সাথে লেন-দেনকারীর উল্লেখ রয়েছে।

সুতরাং সুদ হারাম। একইভাবে আমিও একমত যে, কুরআন বিভিন্ন স্থানে সুদ গ্রহণ করা, সুদ দেওয়া, এসব করতে নিষেধ করেছে। সুদ গ্রহণও নিষেধ। আপনি হয়তো লক্ষ করেছেন আমি আগেই কুরআনের বিভিন্ন আয়াত তিলাওয়াত করেছি, যেমন সূরা বাকারার ২৭৫ নং আয়াতে এখানে বলা হয়েছে—

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ـ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ـ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ـ فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ـ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ـ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ـ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ـ

"কিন্তু যারা সুদ খায় তাদের অবস্থা হয় সেই ব্যক্তির মতো, যাকে শয়তান তার স্পর্শ দিয়ে পাগল ও সুস্থ জ্ঞানশূন্য করে দিয়েছে। তাদের এরূপ অবস্থা হওয়ার কারণ এই যে, তারা বলে ব্যবসা তো সুদের মতোই। অথচ আল্লাহ ব্যবসায়কে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম। কাজেই যে ব্যক্তির নিকট তার খোদার পক্ষ

থেকে এ উপদেশ পৌঁছবে এবং ভবিষ্যতে সুদ হতে বিরত থাকবে সে পূর্বে যা কিছু খেয়েছে তা তো খেয়েছেই, সে ব্যাপার সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর উপর ন্যস্ত। আর যারা এ নির্দেশ পাওয়ার পরও এর পুনরাবৃত্তি করবে, তারা নিশ্চিতরূপে জাহান্নামী হবে, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।"

সুদ ব্যবসার মতো, আল্লাহর ব্যবসাকে বৈধ করেছেন কিন্তু সুদকে করেছেন হারাম। আল্লাহ এখানে সুদ দেওয়া বা নেওয়া উল্লেখ করেন নি। সুদের সর্বপ্রকার লেনদেন নিষিদ্ধ. আরো জানার জন্য আপনাকে হাদীস থেকে বলছি, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'সুদ গ্রহীতা, সুদদাতা, সুদের লেখক এবং সাক্ষী সবাই অভিশপ্ত। তারা সবাই এক।' তারপরের আরেকটি হাসীস মুসলিম শরীফ থেকে উল্লেখ করছি, জাবের (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন, 'সুদ গ্রহীতা, সুদ দাতা, সুদের লেখক ও সাথী তাদের সবাইকে আল্লাহ অভিশাপ দিয়েছেন, সবাই এরা সমান।' আপনি নিশ্চয়ই আপনার উত্তর পেয়েছেন।

প্রশ্ন : আমার মতে, Current Account সুদের সাথে জড়িত না। সুতরাং এক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাখ্যা কী?

উত্তর : আপনি প্রশ্ন করেছেন, মর্ডান ব্যাংকের Current Account এবং ইসলামী ব্যাংকে Current Account-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কিনা?

হ্যাঁ. Current Account-এ আপনি অর্থ বিনিয়োগ করতে পারেন না এবং এ Account আপনাকে কোনো লাভ দেয় না। আপনি কেবল আপনার অর্থের নিরাপত্তার জন্য Current Account ব্যবহার করেন। হ্যাঁ, মর্ডান ব্যাংক যেহেতু Account এ সুদ লেনদেন করে না তাই মর্ডান ব্যাংকের Current একাউন্ট অর্থ রাখা সরাসরি নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু আমি যৌক্তিক কিছু কারণ বলবো যে, কারণে মর্ডান ব্যাংকের কারেন্ট একাউন্টের চেয়ে ইসলামী ব্যাংকের কারেন্ট একাউন্ট অধিক লাভজনক।

প্রথমত যদিও ইসলামী ব্যাংকের এবং মডার্ন ব্যাংকের কারেন্ট একাউন্ট কোনো লাভ দেয় না এবং এগুলো সুদের সাথে জড়িত নয় বা সুদ লেনদেন করে না তবুও মর্ডান ব্যাংকের Current Account-এ রাখা আপনার অর্থ কিছু কিছু প্রকল্পে ব্যবহৃত হতে পারে যেগুলো আসলেই সমাজের জন্য ক্ষতিকর। যেমন. এ অর্থ দিয়ে জুয়ার ব্যাখ্যা হতে পারে কিংবা এমন একটি কারখানা করলো যা মাদক দ্রব্য তৈরি করে, সুতরাং স্বল্প মেয়াদি আপনি অর্থ জমা রেখে সমাজকে আরো পিছিয়ে দেওয়ার কাজে সাহায্য করছেন। কিন্তু আপনি যদি আপনার অর্থ ইসলামী ব্যাংকের Current

একাউন্টে রাখেন তাহলে ইসলামী ব্যাংক এমন একটি প্রকল্প গ্রহণ করবে না যা সমাজের জন্য ক্ষতিকর। ইসলামী ব্যাংকের সকল প্রকল্প বিনিয়োগ শরীয়া বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত। সুতরাং সকল মুসলমান এর প্রতি সন্তুষ্ট থাকে কিন্তু অমুসলিমদের জন্য এটি ক্ষতিকর কিছু করে না। ইসলামী ব্যাংক বলে, আমি হলাম সমাজের জন্য ভ্রাতৃসুলভ। I am only for society.

তাহলে আপনি আরো বলতে পারেন ইসলামী ব্যাংক এবং মর্ডান ব্যাংকে অর্থ রাখার পার্থক্য কী?

ধরুন, আপনার অর্থ আপনি মর্ডান ব্যাংকে রাখলেন এবং ব্যাংক কোনো কারণে অকৃতকার্য হলো, তাহলে মর্ডান ব্যাংকের আইন অনুযায়ী ব্যাংকে Creditor-রা আগে অর্থ নিয়ে নিবে পরে Desitor-রা পাবে এবং সময় সাপেক্ষে Creditor-দেরকে অর্থ দিয়ে দেওয়া হবে এবং অর্থ শেষ হয়ে যেতে পারে। এক্ষেত্রে আপনি অর্থ ফেরত পাবেন না। এভাবে আপনি আপনার অর্থ মডার্ন ব্যাংকে রাখলেন এবং মর্ডান ব্যাংক কোনো সমস্যায় পড়লে আপনার অর্থ ফেরত না পাওয়ার সম্ভবনা থেকে যায়। আর আপনি যদি ইসলামী ব্যাংকে অর্থ রাখেন এবং ব্যাংক সমস্যায় পড়ে ইসলামী ব্যাংকের নিয়ম অনুযায়ী আপনার তথা Derositor আগে অর্থ ফেরত পাবে। সুতরাং এক্ষেত্রে আপনার অর্থ ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তা রয়েছে। এখন বুঝতে পারছেন অর্থনৈতিক দিক বিবেচনায় ইসলামী ব্যাংকের Current Account-এ অর্থ রাখা মর্ডান ব্যাংকের Current Account-এ অর্থ জমা রাখার চেয়ে অধিক নিরাপদ।

প্রশ্ন : আমরা কোন্ ধরনের ব্যাংকে লেনদেন করবো? এবং চাকরি করবো?

উত্তর : আপনি কি একজন মুসলমান? মর্ডান ব্যাংকের কথা বলছেন না ইসলামী ব্যাংকের? আচ্ছা ধরলাম, আপনি ইসলামী ব্যাংকের কথা বলছেন বা আধুনিক ব্যাংক ও হতে পারে। ধরলাম, আপনি আধুনিক ব্যাংকের কথা বলেছেন। আমি আগেই বলেছি যাই কিছু হোক না কেন, যা সুদের সাথে জড়িত তা নিষিদ্ধ। আপনি সুদ দেন, সুদ গ্রহণ করেন, অথবা সুদের লেখক হন বা সাক্ষী হন না কেন, আমি সহীহ্ মুসলিম শরীফ থেকে উল্লেখ করতে পারি।

খন্ড ৩, অধ্যায় ৬২৮, হাদিস নং ৩৮৮১। জাবের (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন, "সুদ গ্রহীতা, সুদদাতা, সুদের লেখক এবং সুদের সাক্ষী সবাই সমান।"

সুতরাং ব্যাংকে রেকর্ড রাখা হলো সাক্ষী হওয়া। তাহলে সহীহ্ মুসলিম থেকে জানা গেল আধুনিক ব্যাংককে লেনদেন করা, চাকরি করা হারাম। এখন আপনি আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন, 'আমি বর্তমানে আধুনিক ব্যাংককে চাকরি করছি। আমি এখন কি করবো? আমি কি এ ব্যাংক ত্যাগ করবো?' হ্যাঁ, যদি আপনার ব্যাংক ত্যাগ করার সুযোগ থাকে তাহলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ত্যাগ করুন। আপনার কি করা উচিৎ? আপনার এখন অন্য কোনো বিকল্প খোঁজ করার চেষ্টা করতে হবে। আপনি এখন যে কাজ করছেন তা ত্যাগ করে অন্য কোনো পেশা গ্রহণ করা উচিৎ। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক যে, এখন এমন অনেক লোক আছে যারা বলবে যে, আমি তো মর্ডান ব্যাংক ত্যাগ করতে চাই কিন্তু আমার তো সে সুযোগ নেই। কারণ, মর্ডান ব্যাংক থেকে ৪০ হাজার টাকা পাই। কিন্তু তারা অন্য কোথাও থেকে ৩০ হাজার টাকা পেতে পারি। তারা অন্য পেশা গ্রহণ করতে পারে। সেখান থেকে ৩০ হাজার টাকা পাবে।

আমি অন্য কোনো কোথাও থেকে চাকরি করলে তা মর্ডান ব্যাংকের মতো সমতুল্য বেতনের চাকরি পাবে না, অর্থাৎ বলা হচ্ছে, তাদের অন্য কোনো পছন্দ বা সুযোগ নেই বিকল্প নেই। অবশ্যই তাদের সুযোগ আছে বরং তারা ভয় পচ্ছে। তারা এ বেতন অন্য কোথা থেকে পেতে পারে। যদি তারা ৪০ হাজার টাকা নাও পায় তাহলে তারা ৩০ হাজার টাকার চাকরি করবে। আসলে আরো অল্প সময়ে বেশি অর্থ চায় এবং তারা আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছে। সুতরাং আপনি যদি মর্ডান ব্যাংকে চাকরি করে থাকেন, তাহলে আমি আপনাকে পরামর্শ দিব যে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এ ব্যাংক ত্যাগ করেন এবং অন্য চাকরি করেন। যদিও তা কম বেতনের হোক। ইনশাল্লাহ হয়তো আপনি পরবর্তীতে বেশি বেতন পাবেন। আর আপনি যদি বেশি বেতন নাও পান তাহলে আল্লাহ আপনাকে পরকালে এর পুরস্কার দিবেন। যদি এ কোম্পানির সাহায্যে প্রাপ্ত না হন। সাহায্য না পান তাহলে আপনি প্রতিদান হিসেবে কমপক্ষে ৭০০ গুণ বেশি পেয়ে যাবেন। যদি আপনি আল্লাহকে ভয় করেন। কিন্তু আপনি যদি বলেন, আমি এখন মর্ডান ব্যাংকে চাকরি করছি এ উদ্দেশ্যে যে, আমি এখন আধুনিক অর্থ ব্যবস্থা বুঝার চেষ্টা করছি যাতে আগামি চার বছর পর যে ইসলামী ব্যাংক শুরু করতে যাচ্ছি তা যেন আরো ভালোভাবে পরিচালনা করতে পারি। আধুনিক ব্যাংকের চেয়েও ভালোভাবে।

আশা করা যায়, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করবেন। কারণ, আপনার আসল উদ্দেশ্য হলো, ইসলামী ব্যাংকিং সিস্টেম আরো ভালোভাবে পরিচালনার জন্য এবং বাস্তবায়নের জন্য মর্ডান ব্যাংকিং শেখা। একইভাবে আপনি যদি কোনো কলসপের

কথা, যদি আপনি কলসপে কাজ করেন তা অবশ্যই হারাম হবে। কিন্তু আপনি যদি বলেন যে, আমি এখানে ২-৩ মাসের জন্য চাকরি করবো এ উদ্দেশ্যে যে, এটাকে বন্ধ করে দিবো এবং এটাকে আমি মেডিকেল সেন্টারে পরিবর্তিত করে ফেলবো। তাহলে আমি মনে করি, আল্লাহ্ আপনাকে সহযোগিতা করবেন। সুতরাং আপনি মর্ডান ব্যাংককে চাকরি করতে পারেন যেন এ মর্ডান ব্যাংককে ইসলামী ব্যাংকে পরিবর্তন করতে পারেন। কিন্তু আপনি যদি শুধু বেতনের জন্য বেশি বেতনের উদ্দেশ্যে মর্ডান ব্যাংকে চাকরি করেন তাহলে আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করবেন না।

প্রশ্ন : ইসলামী ব্যাংকের সার্ভিস চার্জ কি মর্ডান ব্যাংকের সুদ আদায়ের মত নয়? ইসলামী ব্যাংক গ্রাহকদের আকর্ষণ করার জন্য এ বিকল্প শব্দ ব্যবহার করে থাকে?

উত্তর : আপনি প্রশ্ন করেছেন যে, ইসলামী ব্যাংক সার্ভিস চার্জ হিসেবে যে ফী নেয় তা মর্ডান ব্যাংকের সুদ চার্জ করার মতো কিনা। শুধু মুসলিমদেরকে আকর্ষণ করার জন্য শব্দ পরিবর্তনের কৌশল নয়? এটা কি মুসলমানদের সেন্টিমেন্টকে ব্যবহার করা নয়? আমি আমার বক্তব্যের তৃতীয় অধ্যায় বিশ্লেষণ করেছিলাম যে, এটি একটি বিতর্ক-ই বটে। আধুনিক ব্যাংক যে সুদ গ্রহণ করে থাকে তা আমি ১১% বলে উল্লেখ করে থাকলে আমি দুঃখিত। এটা ১৪% থেকে ১৫% এর মতো। এটা প্রকল্পের ওপর নির্ভর করে। এটা ২০% পর্যন্তও হতে পারে। আপনি যদি ইসলামী ব্যাংকের বায়তুন নসর থেকে কোনো নির্দিষ্ট প্রকল্পের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ ঋণ নিতে চান তাহলে ইসলামী ব্যাংক আপনার নিকট থেকে সার্ভিস চার্জ আদায় করবে, তা হতে পারে ১০% থেকে ১৫% এর মধ্যে। এটা ৮% থেকে ১০%-এর মধ্যে ওঠা-নামা করে। কিন্তু ২ বছর পর এটা ১৪% হতে পারে।

এক্ষেত্রে আপনি বলতে পারেন যে, মর্ডান ব্যাংকের ১৬% সুদ আদায় করা আর ইসলামী ব্যাংকের ১৪% সার্ভিস চার্জ আদায় করা একই কথা। আপনি বলতে পারেন ২% পার্থক্য সামান্য। এক্ষেত্রে কেবল শব্দ পরিবর্তন করা হয়েছে। আমাদের প্রথমে বিশ্লেষণ করতে হবে যে, ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যেমন ইসলামী ব্যাংক যে সার্ভিস চার্জ নেয় তা আসলে লাভ লোকসানের ওপর ভিত্তি করে। এটা সুদভিত্তিক নয়। কিন্তু আধুনিক ব্যাংকগুলো নির্ধারিত এবং নির্দিষ্ট হারে সুদ আদায় করে এটা ১৫% থেকে ১৬% হতে পারে। অথচ ইসলামী ব্যাংক যে সার্ভিস চার্জ নেয় তা ১ বছরের লাভ লোকসানের ওপর ভিত্তি করে। তা কোনো নির্দিষ্ট Company বা Institute-এর পার্থক্য হতে পারে।

সুতরাং যত বেশি মানুষ ইসলামী ব্যাংকিং-এর সাথে জড়িত হবে সার্ভিস চার্জ ততই হ্রাস পাবে। তারা সর্বোচ্চ চেষ্টা করে এটা ৮% হতে ৯% এর মধ্যে রাখতে। কিন্তু আমাদের প্রত্যেকে বুঝতে হবে যে, যদি আপনি বিশ্লেষণ করে দেখেন, কোনো ইসলামী ইনস্টেমেন্ট কোম্পানিতে Fixed deposit করেন, ধরুন বরকত Investment-এ। বর্তমানে ইন্ডিয়াতে কোনো Investment company নেই যা পুরোপুরি ইসলামী Investment rule মেনে চলে। কেননা IRB এগুলোকে ব্যাংক হিসেবে কার্যক্রম চালাতে অনুমতি দেয় না। এগুলো কোনো চেক ইস্যু করতে পারে না। IRB তাদের এ অনুমতি দেয় না। ইসলামী ব্যাংক যে ধরনের বিনিয়োগ প্রাধান্য দেয় তা হতে এমন যে, উদাহরণস্বরূপ, বরকত ইনভেস্টমেন্ট। যদি আপনি আপনার অর্থ মুসারাকা অথবা মুদারাবা পদ্ধতিতে স্থায়ী আমানত করেন তাহলে আপনি যে মুনাফা পাবেন বা তারা আপনাকে যে লাভ দিবে তা ১৬% হতে ২৬%-এর মধ্যে হতে পারে। তারা সে যে খরচ দেখায় তা একটির ক্ষেত্রে ১৬%, আবার আরো বেশি ১৭%, আবার অন্যের আরো বেশি ১৮%।

উদাহরণস্বরূপ, বরকত ইনভেস্টমেন্ট ১৯% লাভ বা মুনাফা দেয়। এবং ব্যাংক আপনার নিকট থেকে যে সার্ভিস চার্জ আদায় করে যদি আপনি বায়তুন নসর যা কিনা বরকত ইনভেস্টের সাথে সম্পর্কিত, ঋণ নেন তাহলে তারা আপনার নিকট থেকে ১৪% সার্ভিস চার্জ আদায় করবে। আপনি যদি চালাক হন তাহলে ব্যাংকে বায়তুন নসরে ১ লাখ টাকা জমা বা বিনিয়োগ করুন এবং ৯০ হাজার অথবা ১ লাখ টাকা নিন। যেহেতু আপনি একই সময়ে ১ লাখ টাকা ফেরত পাচ্ছেন, আপনি বায়তুন নসর থেকে আপনার ডিপোজিটের ওপর ভিত্তি করে ১ লাখ টাকা লোন নিতেও পারেন। এবং এর জন্য আপনাকে শুধু ১০% সার্ভিস চার্জ দিতে হবে। সুতরাং সরাসরি আপনি যদি ১ লাখ টাকা ডিপোজিট করছেন তখনই ৯০ হাজার টাকা পেতে পারেন। একই দিন ১ লক্ষ টাকার ভিত্তি করে বায়তুন নসর থেকে পাবেন এবং বছর শেষে আপনাকে ১৪% হারে ১৪ হাজার টাকা দিতে হবে।

কিন্তু আপনি যদি বিশ্লেষণ করে দেখেন যে, আপনি বরকত ইনভেস্টমেন্ট থেকে যে ১৯% মুনাফা পেলেন এবং যে ১৪% সার্ভিস চার্জ দিলেন তা আদৌ পরস্পরে সম্পর্কিত নয়। আধুনিক ব্যাংকে এটা পরস্পর সম্পর্কিত। এটা ব্যাংক যে Fixed deposit করে তা সুদের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। এটা ১০% থেকে ১১% হতে প্যারে। এবং আপনি যদি এ ব্যাংক থেকে কোন ঋণ নেন তাহলে তারা আপনার থেকে ১৬% আদায় করবে। তাদের এ শতকরা হার সর্বদায়ই ৫% বেশি হয় যা তারা আমানতকারীকে দেয় তার থেকে। ইসলামী ব্যাংক কখনোই এমন করে না।

সুতরাং সার্ভিস চার্জ এবং সুদের মধ্যে সম্পর্ক সম্পূর্ণ ভিন্ন। আপনি যদি চান সার্ভিস চার্জ কমাতে তাহলে আপনার উচিৎ হবে অধিক সংখ্যক মুসলিমকে ইসলামী ব্যাংকের সাথে জড়িত হতে রাজি করা, এ ব্যাংকের ওপর আস্থা সৃষ্টি করে অধিক বিনিয়োগ করতে রাজি করা। ইনশাআল্লাহ সার্ভিস চার্জ আরো কমে যাবে।

প্রশ্ন ঃ ডা বাকের 'বেদ'-এর অর্থনৈতিক সিস্টেম অধ্যয়ন করে বলেছেন, 'বেদ' এ লেখা অর্থনৈতিক সিস্টেম সুদমুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। তিনি আরো দাবী করেন, যদি বেদ এ বর্ণিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা India-তে বাস্তবায়ন করা হয় তাহলে সামাজিক বৈষম্য দূর হয়ে আমাদের সমাজে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা হবে। সুতরাং বেদ-এর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যদি কুরআনে বর্ণিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সমতুল্য হয় তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে 'বেদ'-এর লেখক একজন আল্লাহর নবী?

উত্তর : অধ্যাপকের নাম, ড. বাকার বা বাকরে। তিনি বলেছেন যে, 'বেদ' যদি সুদমুক্ত অর্থনীতি বিষয়ে বলে থাকে তাহলে তা কি কুরআন বর্ণিত অর্থনৈতিক বিধানের মতো এক? এবং এ 'বেদ'-এর বর্ণনা যদি কুরআনের বর্ণনার সাথে মিলে যায় তাহলে কি 'বেদ' এর গ্রন্থকার একজন আল্লাহর নবী?

প্রথম প্রশ্ন সম্পর্কে আমিও একমত। কুরআন যেমন সুদমুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে বেদও তেমনি সুদমুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বর্ণনা করেছে। কিন্তু এর বাস্তবায়ন পার্থক্য হতে পারে? এটা পার্থক্য হতে পারে যেমন আপনারা সুদ মুক্ত অর্থনৈতিক পদ্ধতিতে পার্থক্য দেখেছেন। এর বাস্তবায়ন পদ্ধতিতে পার্থক্য হতে পারে। সুদমুক্ত পদ্ধতি যেমন বাস্তবায়নে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন হাদীস থেকে মত পার্থক্য দেখান একইভাবে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ বাস্তবায়ন পদ্ধতিতে মত পার্থক্য করেন। বেদ যদি সুদমুক্ত ব্যবস্থার কথা বলে এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যদি সুদ মুক্ত হয় তাহলে ইনশাল্লাহ এটা স্থায়ী হবে।

এবার প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ সম্পর্কে বলছি। এই প্রশ্ন এ অর্থ বুঝায় যে, 'বেদ' যদি ওহী হয়ে থাকে তাহলে এর গ্রন্থকার কি আল্লাহর নবী হবেন না? একটি বিষয় বুঝতে হবে যে, কুরআন নাজিল হওয়ার পূর্বে আরো অনেকগুলো আসমানী কিতাব এসেছে। এর মধ্যে চারটি নাম হলো : তাওরাত, যাবুর, ইনজিল এবং ফুরকান। ফুরকান হলো কুরআন।

তাওরাত হলো হযরত মুসা (আ)-এর ওপর নাযিল হওয়া আল্লাহর কিতাব।

যাবুর হলো হযরত দাউদ (আ)-এর ওপর নাজিল হওয়া আল্লাহর কিতাব।

ইনজিল হলো হযরত ইসা (আ)-এর ওপর নাজিল হওয়া আল্লাহর কিতাব।

আর ফুরকান হলো কুরআন, কুরআন হলো শেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ এর ওপর নাযিল হওয়া আল্লাহর দেওয়া সর্বশেষ কিতাব। এ কিতাব নাযিল হওয়ার পূর্বে আরো অসংখ্য কিতাব নাযিল হয়েছে যেগুলো নাম উল্লেখ নেই। সুতরাং আপনি কুরআন থেকে সকল নবীর নাম জানতে পারবেন না। কুরআন মোট ২৫ জন নবীর নাম উল্লেখ করেছে। তার মধ্যে কতকগুলো হলো আদম, ইব্রাহীম, সুলাইমান, দাউদ, ইয়াকুব, মুসা, ইসা, মুহাম্মদ ﷺ ইত্যাদি। হাদীসে মোট ৯৯ জন নবীর নাম উল্লেখ আছে, কিন্তু হাদীস থেকে জানা যায়, মোট ১ লক্ষ ২৪ হাজার নবীর সংখ্যা, যেমন কুরআন বলে, প্রত্যেক জাতির জন্য পথপ্রদর্শক ও সতর্ককারী পাঠানো হয়েছে। সুতরাং আল্লাহর বাণী বিভিন্ন ভাবে নাযিল হয়েছে।

এসব বাণী আল্লাহর নবীর নয়, আল্লাহর নাজিলকৃত। কিন্তু আপনি আমাকে কুরআন ও বাইবেলের কিছু অংশের মিল সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারেন। যদি বাইবেলের কিছু অংশ কুরআনের সাথে মিলে যায় বা বাইবেলের কিছু কিছু অংশ কুরআনের সাথে মিল পাওয়া যায় তাহলে কি আপনি বলবেন, বাইবেল আল্লাহর বাণী? 'বেদ' এর কিছু কিছু অংশও যদি মিলে যায় তাহলে কি আপনি বলবেন, বেদ আল্লাহর বাণী। আপনি তা বলতে পারেন না। যদিও কোনো কোনো অংশ মিলে যায় তাহলে, এটা হয়তো আল্লাহর পক্ষ থেকে, আবার এটা হয়তো আল্লাহর পক্ষ থেকে নাও আসতে পারে। যদি এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেও থাকে তবুও আপনি এর সাথে একমত হতে পারেন না। কারণ এটা চূড়ান্ত, শেষ নাযিলকৃত ওহী বা কিতাব নয়। শেষ কিতাব হলো কুরআন। এবং এ সম্পর্কে কুরআনের সূরা বাকারার ১০৬ নং আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে–

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا اَوْمِثْلِهَا - اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -

অর্থ : "আমি কোন আয়াত রহিত করলে অথবা বিস্মৃত করে দিলে তদ্‌পেক্ষা উত্তম অথবা তার সমপর্যায়ের আয়াত আনয়ন করি। তুমি কি জানো না যে, আল্লাহর সব কিছুর ওপর শক্তিমান?"

যাহোক কোনো কোনো ক্ষেত্রে মিল থাকতে পারে, কোনো কোনো বাণী কুরআনের আয়াতের মতো হতে পারে। তাই বলে আপনি বলতে পারেন না যে, এগুলো কুরআনের বাণী।

উদাহরণস্বরূপ, বাইবেলের অনেক বাণী আছে যা কুরআনেরও বাণী। আবার বাইবেলের কোনো কোনো বাণী ইনজিলেও আছে। তাই বলে আপনি বাইবেলের সব শব্দকে আল্লাহর বাণী বলতে পারেন না। একইভাবে আপনি বেদকে আল্লাহর বাণী বলতে পারেন না। হয়তো বা এটা আল্লাহর বাণী হতে পারে। কিন্তু আমি নিশ্চিত না। তবে নিশ্চিতরূপে বলা যায় ইনজিল-এর কিছু অংশ আল্লাহর বাণী।

প্রশ্ন : ডা. জাকির, আপনি কুরআন থেকে উল্লেখ করেছেন যে, রিবা অর্থ হলো সুদ। সুতরাং সুদ বা *Interest* হলো *Usary*-এর একটি রূপ। এখন আমার প্রশ্ন হলো আমি ব্যবসা করার জন্য প্রকল্প পাস করতে চাই। কিন্তু বর্তমান ইন্ডিয়ার বিভিন্ন জটিল পরিস্থিতিতে এমন একটি প্রকল্প পাস করানোর জন্য সুদ দেওয়া বাধ্যতামূলকই বলা যায়। এখন এ ব্যবস্থা করে আমি লাভ করলাম, তখন আমার এ উপস্থিত অর্থ কি সুদ হবে?

উত্তর : আপনি যে প্রশ্ন করেছেন তা সংক্ষেপে সুদ বৈধ কিনা। যেহেতু আমরা সুদভিত্তিক তথা আমরা যে পদ্ধতির মধ্যে জীবনযাপন করি তা সুদের সাথে জড়িত। তাহলে আপনি যদি কোনো প্রকল্প হাতে নেন এবং এ থেকে যে সুদী অর্থ পাবেন তা ঘুষ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে কি না? প্রশ্ন হলো, আপনি ইসলামী ব্যাংক থেকে ব্যবসার জন্য অর্থ ঋণ নিলেন এবং আপনি একটি প্রকল্পের বিনিয়োগ করতে চান। সমাজ ঘুষ চক্রের কারণে এ প্রকল্পের জন্য ইসলামী ব্যাংক থেকে নেওয়া অর্থ হতে সুদ দিতে হলো, এখন এ প্রকল্প থেকে যে লাভ উপার্জন হবে তা কি সুদ হয়ে যাবে?

সংক্ষেপে আপনার প্রশ্ন হলো ঘুষ বৈধ কিনা? আপনিই সংক্ষেপে বলুন, ঘুষ বৈধ না অবৈধ? আপনি ব্যাংক থেকে যে হালাল অর্থ নিলেন তা দিয়ে কি ঘুষ দেওয়া যাবে? আপনি কি দায়ী হবেন না? মনে করুন, আমি ৫০ হাজার টাকা মুনাফা অর্জন করলাম এবং ৫ হাজার টাকা ঘুষ দিলাম। তাহলে আপনি বলতে পারবেন যে ৫০ হাজার টাকা? ৫ হাজার টাকা সুদের ফিস। সুতরাং নিট মুনাফা হবে ৪৫ হাজার যদি ৫ হাজার টাকা ঘুষের জন্য ব্যয় হয়।

ভাই, আপনাকে প্রথমে বুঝতে হবে যে, ঘুষ ইসলামে নিষিদ্ধ। আপনি কি হারাম অর্থ প্রত্যাশা করেন না হালাল অর্থ? জবাবদিহিতার ব্যাপার তো পরের ব্যাপার। ঘুষ দেওয়া আপনার জন্য জায়েয না। এ সম্পর্কে কুরআনে স্পষ্টভাবে এসেছে সূরা বাকারার ১৮৮ নং আয়াতে। এ আয়াতে বলা হয়েছে–

وَلَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ .

অর্থ : "তোমরা পরস্পর পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না। অন্যায়ভাবে এক ধরনের মানুষের সম্পদ খাওয়ার জন্য শাসকদের নিকট সমর্পণ করো না, অথচ তোমরা জানো।"

কুরআন ঘুষকে হারাম রেখেছে এবং ঘুষ দেওয়াও হারাম। আমি কি ঘুষ নিতে পারবো? আমি এ সম্পর্কে অনেক উল্লেখ করতে পারি। আহমদ থেকে একটি হাদীস স্পষ্টভাবে এসেছে, যে ঘুষ গ্রহণ করে যে ঘুষ দেয় যে, এবং ঘুষের মধ্যস্থতাকারীদের সবাইকে আল্লাহ অভিশাপ দিয়েছেন। সুতরাং ঘুষ (দেওয়া নেওয়া) লেনদেন হারাম। এরপর প্রশ্ন ওঠার সুযোগ নেই যে এটা সঠিক বা সঠিক নয়।

ইসলামী ব্যাংকের আপনি ঘুষ দিতে পারবেন না।

আপনি যদি বলেন আমি ঘুষ দিব তাহলে আপনাকে বলবে আপনি টাকা নিবেন না।

এটা কি ইন্ডিয়াতে অনুমোদিত? আমি জানি না। ইসলামী শরীআতের....আপনি যদি বলেন আমি একটি শিল্প কারখানা করার জন্য টাকা চাই এবং এজন্য আপনাকে টাকা দিব তাহলে এটা হারাম হবে, আমি এটাকে হারাম বলবো। আপনি এ অর্থ ঘুষের কাজে ব্যবহার করতে পারেন না। ইসলামী আইনে এটা বৈধ নয় এবং এটা জানার পর আপনি এটা করেন তাহলে তা হবে আল্লাহর সাথে প্রতারণা। দায়িত্বশীলতা থেকে তা জবাবদিহিতা যাই বলুন না কেন ঘুষ হারাম। কেননা, আল কোরআনে ইনজিল শব্দটি উল্লেখ আছে। এটা আল্লাহর বাণী, কিন্তু 'বেদ' সম্পর্কে কুরআন কিছুই বলা হয় নি। সুতরাং এটা হতেও পারে, নাও হতে পারে। এটা আপনার ভাবনার বিষয় নয়। আপনার দায়িত্ব হলো আপনাকে সর্বশেষ কিতাব কুরআনের প্রতি বিশ্বাস রাখা।

প্রশ্ন : ইসলামে কি ইন্স্যুরেন্স বৈধ? বিশেষ করে লাইফ ইন্স্যুরেন্স? যদি এটা ইসলামে বৈধ না হয় তাহলে অন্য কোনো বিকল্প ব্যবস্থা আছে কি? অথবা অন্য কোনো ইসলামিক সমাধান আছে?

উত্তর : বীমার ধারণাটি অনেক পুরাতন। কোনো সম্প্রদায়ের লোকজন অর্থ জমা করতে পারে এবং এটা প্রয়োজনে ব্যবহার করা যেতে পারে। আপনার কোনো দুর্ঘটনায় যা জরুরি প্রয়োজনে আপনাকে সাহায্য করতে পারে। এ জমা রাখা অর্থ ব্যবহার একটি ভালো কনসাপ্ট। কিন্তু জীবন বীমার কথায় আমি তাহলে এটাকে কি বৈধ বলা যায়? মিশরের মাওলানা মোঃ আবু জরার দেওয়া ফতোয়া অনুযায়ী কিন্তু জীবনবীমা, যাতে আপনি মাসিক কিস্তি হিসেবে টাকা জমা দেন এবং আপনার কোনো

দুর্ঘটনা ঘটলে আপনি পুরো অর্থ বা দ্বিগুণ পরিমাণ ফেরত পান কিংবা এ সেবার শেষে আপনি পুরো অর্থ লাভসহ ফেরত পান তাহলে তা রিবা ছাড়া কিছুই নয়।

সুতরাং সংক্ষেপে বলা যায়, যে বিনিয়োগই হোক না কেন, তা জীবনবীমা হোক, গাড়ী বীমা হোক আর মুনাফা বীমা হোক তা যদি সুদভিত্তিক হয় তাহলে তা হারাম। যে কোনো সুদী বিনিয়োগই হারাম। মাওলানা সাহেবের নিয়ম অনুযায়ী বর্তমানের জীবন বীমা করপোরেশনগুলোর অধিকাংশ বিনিয়োগই Fixed Money Market-এর। সুতরাং যে অর্থই হোক, যেমন ধরুন, আপনার একটি ১০ বছর মেয়াদি পলিসি আছে যেখানে প্রতি বছর ১ লক্ষ টাকা জমা দিতে হয় এবং যদি আপনি এর মধ্যে মারা যান কিংবা দুর্ঘটনায় শিকার হন আপনি যদিও মাত্র দুই কিস্তির অর্থ পরিশোধ করেন (১ লক্ষ টাকা) তাহলেও আপনি দ্বিগুণ তথা দুই লক্ষ টাকা ফেরত পাবেন। আর আপনি যদি স্বাভাবিকভাবে মারা যান তাহলে আপনি পুরো অর্থ ফেরত পাবেন। আপনার পলিসি ম্যাচিউরিটির আগেই যদি মারা যান। আপনি পুরো ১০ লক্ষই লাভসহ ফেরত পাবেন। কিন্তু আপনাকে এ লাভ কোথা হতে দেওয়া হবে? জীবন বীমা করপোরেশনের অধিকাংশ বিনিয়োগই ফিক্সড মানি মার্কেট হার থাকে, যা কিনা সুদভিত্তিক। আপনি তো জানেনই যে সুদ হারাম। আপনি যদি জানেন যে, কোনো প্রতিষ্ঠান যারা বীমা দিয়ে থাকে এবং তারা Fixed Money Market-এর সাথে জড়িত নয় এবং শেয়ার, ইকুইটির সাথে জড়িত তাহলে এ বীমা বৈধ হবে।

সম্প্রতি এই কিছুদিন আগে আমি ইংল্যান্ডের লন্ডনে পরিচালিত 'গোল্ডেন বন্ড' নামক একটি ফার্ম থেকে দেখে এলাম, তাদের সর্বনিম্ন বিনিয়োগ পরিমাণ আড়াই হাজার পাউন্ড। অর্থাৎ আপনাকে কমপক্ষে ২.৫ হাজার পাউন্ড বিনিয়োগ করতে হবে যা কিনা ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার সমান। তারা (Golden Bond] আপনার নিকট থেকে এ পরিমাণ অর্থ নিবে এবং তা শেয়ার ও ইকুয়িটি তে বিনিয়োগ করে থাকে, যা ইসলামে বৈধ।

শেয়ার এবং ইকুয়িটি Fixed Money Market-এর সাথে জড়িত নয়। তারা আপনাকে সম্ভাব্য একটি পরিমাণ মুনাফা দিবে, কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ নয় বলা যায় তা হতে পারে ১% বা $\frac{১}{২}$% এটা নির্দিষ্ট অংক নয় বরাং কাছাকাছি সম্ভাব্য একটা পরিমাণ এবং তারা আপনাকে আরো কিছু সুবিধা দিবে যদি আপনি মারা যান, এক্ষেত্রে অতিরিক্ত বোনাস পেতে পারেন। ফলে এ ধরনের বিনিয়োগ যা সুদের কারবারে সম্পর্কিত নয় তা অনুমোদিত। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ জীবন বীমা কোম্পানিগুলো Fixed Money Market-এর সাথে জড়িত তা ইসলামে বৈধ নয়। এগুলো হারাম। যে সব বীমা সুদের বা রিবা নিয়ে কারবার করে তা সম্পূর্ণই হারাম।

এখন আপনার প্রশ্ন ছিল অন্য কোনো বিকল্প আছে কিনা? কিংবা জীবন বীমা ইসলামী শরীয়াহভিত্তিক হতে পারে কিনা? আপনি যদি ইসলামী শরীয়াহভিত্তিক ব্যাংক দেখতে বা পেতে পারেন তাহলে কেন ইসলামী শরীয়াহভিত্তিক জীবন বীমা হতে পারবে না? কেন আপনি শরীয়াহ ভিত্তিক বীমা পাবেন না?

পাকিস্তানের করাচীর দারুল উলুম এর মুফতি মোহাম্মদ শফী (র) এ ব্যাপারে একটি ভালো সমাধান দিয়েছেন, তিনি বলেন, আপনি অবশ্যই শরীয়াভিত্তিক জীবন বীমা পেতে পারেন। তার মতে, আপনি কীভাবে মাসিক প্রিমিয়াম, মাসিক কিস্তি জীবন বীমা করাবেন, আপনি কীভাবে ইসলামী জীবন বীমা করাবেন। আপনি যে মাসিক কিস্তি দিবেন তা মুদারবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ হবে। আপনি মাসিক কিস্তি হিসেবে যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা দিবেন তা মুদারবা সিস্টেমে বিনেয়াগ হবে। তখন আপনি যে অর্থ বিনিয়োগ করলেন তা থেকে লভ্যাংশ পাবেন, এ লাভের নির্দিষ্ট অংশ যেমন তা হতে পারে $\frac{১}{৪}$ বা $\frac{১}{৩}$ ভাগ আলাদা একটি বক্সে রেখে দিলেন। আপনার লাভের নির্দিষ্ট পরিমাণ আলাদা করে রাখলেন, এখন মনে করুন এ ইসলামী শরীআভিত্তিক জীবন বীমার কোনো শেয়ার হোল্ডার, বিনিয়োগকারী কোনো সমস্যায় পড়লে যেমন তা হতে পারে কোনো দুর্ঘটনা, তাহলে আপনি তাকে চিকিৎসা সেবা দেওয়ার জন্য আপনার ঐ নির্দিষ্ট বক্স থেকে অর্থ দিতে পারেন। এবং আপনার এ দেওয়ার পরিমাণটা একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাখতে পারেন, এ দেয় পরিমাণটা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন হতে পারে, আপনিও যেসব কারণে পেতেও পারেন, আপনার যদি কোনো রোগ হয় তাহলে আপনি নির্দিষ্ট পরিমাণ পাবেন, আবার নির্দিষ্ট পরিমাণ অন্যের রোগ হলে দিবেন। এসব বিষয়গুলো শর্তের ওপর নির্ভর করবে। ইসলাম আপনার এ নিজস্ব বক্সের অর্থ ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছে। কারণ, আপনার এ বক্সের অর্থ আপনার লাভের একটা অংশ।

আধুনিক জীবন বীমা পদ্ধতিতে আপনাকে মাসিক কিস্তি হিসেবে অর্থ জমা দিতে হবে এবং আপনি যদি আপনার মাসিক কিস্তি পরিশোধ বন্ধ করে দেন তাহলে আপনার পূর্বের জমা দেওয়া সকল অর্থ ফেরত পাবেন না। তারা আপনাকে একটি পয়সাও ফেরত দিবে না।

আপনি যদি আপনার কিস্তি দেওয়া বন্ধ করে দেন, তাহলে প্রিমিয়ামসহ পুর্বের সব অর্থই বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। আপনার অতীতের সর্ব অর্থই লাভসহ মার খাবে।

প্রকাশক কর্তৃক সংযোজিত

পরিশিষ্ট

প্রশ্ন : ১. ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য কী?

উত্তর ঃ ১. মানুষ সম্পদের ব্যবহারকারী।

২. হারাম বা সমাজের জন্য ক্ষতিকর দ্রব্যের উৎপাদন বা ব্যবসা করা যাবে না যদিও তা লাভজনক হয়।

৩. উৎপাদন খরচ কমানোর জন্য ন্যায্য মজুরী বা কাঁচামালের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

৪. নিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড।

৫. সম্পদের কেন্দ্রীভূত হওয়ার পথ বন্ধ।

প্রশ্ন : ২. ইসলামী ব্যাংক কাকে বলে?

উত্তর : সম্পদ আহরণ, উন্নয়ন ও বণ্টনের সাথে সম্পৃক্ত আর্থিক লেনদেনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী নীতিমালার আলোকে পরিচালিত ব্যাংকই হচ্ছে ইসলামী ব্যাংক।

ইসলামী সম্মেলন সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত সংজ্ঞাটি নিম্নরূপ :

Islamic Bank isa Financial Institution, whose status, rules and proceduces expressly state its commitment to the principles of Islamic Shariah & to the banning of the recitp and payment of interest on any of its operation.

"ইসলামী ব্যাংক হচ্ছে এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা তার উদ্দেশ্য, আইন কানুন ও কর্মপদ্ধতির সকল স্তরে ইসলামী শরীয়তের নীতিমালা মেনে চলতে এবং কার্যক্রমে সুদের লেনদেন সম্পূর্ণ বর্জন করতে বদ্ধপরিকর।"

প্রশ্ন : ৩. ইসলামী ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য কী?

উত্তর : ১. ইসলামী ব্যাংক সুদের লেন-দেন করে না।

২. ইসলামী ব্যাংক হারাম ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করে না।

৩. ইসলামী ব্যাংক ঋণের কারবার করে না বরং বিনিয়োগ প্রদান করে।

৪. ইসলামী ব্যাংক শরীয়াহ মোতাবেক পরিচালিত।

৫. ইসলামী ব্যাংক ব্যবসায়ের ঝুঁকি বহন করে।

৬. মুনাফার নিশ্চয়তা নেই।

৭. আমানতকারীগণ নির্দিষ্ট কোনো মুনাফা পান না।

প্রশ্ন : ৪. সুদের বৈশিষ্ট্য

উত্তর : ১. সুদ ঋণের সাথে জড়িত, সেটা অর্থ-ঋণ হোক অথবা পণ্য-ঋণ।

২. আসলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া।

৩. সময়ের অনুপাতে বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ধারিত হওয়া।

৪. সময়ের অনুপতে আসল বৃদ্ধি পাওয়াকে ঋণের শর্ত হিসেবে গ্রহণ করা।

প্রশ্ন : ৫. আল ওয়াদীয়াহ কী?

উত্তর : ইসলামী ব্যাংক আল-ওয়াদীয়াহ নীতির ভিত্তিতে চলতি হিসাবে আমানত গ্রহণ করে। আল-ওয়াদীয়াহ হচ্ছে ব্যবহারের অনুমতিসহ আমানত রাখা। ব্যাংক আমানতদতার হিসাবে আমানতের নিরাপত্তা বিধান করে। ব্যাংক এখানে আমানতের মালিক নয় বরং আমানতদার। সে আমানতদারীর অনুমতি সাপেক্ষে এ আমানত ব্যবহার করে।

প্রশ্ন : ৬. মুদারাবা কী?

উত্তর : ইসলামী ব্যাংক মুদারাবা নীতির ভিত্তিতে সঞ্চয়ী হিসাবে আমানত গ্রহণ করে থাকে। মুদারাবা হচ্ছে এমন এক ধরনের কারবার চুক্তি, যেখানে একপক্ষ অর্থের যোগান দেয়, অপর পক্ষ শ্রম ও সময় বিনিয়োগ করে কারবার পরিচালনা করে। কারবারে লাভ হলে পূর্ব নির্ধারিত হারে উভয় পক্ষ তা ভাগ করে নেয়, কিন্তু লোকসান হলে পুঁজির মালিককে সম্পূর্ণ বহন করতে হয়। এক্ষেত্রে উদ্যোক্তা তার শ্রমের বিনিময়ে কিছুই পায় না। এরূপ কারবারে অর্থের যোগানদাতাকে বলা হয় সাহিব আল-মাল বা পুঁজির মালিক এবং কারবার পরিচালককে বলা হয় মুদারিব বা উদ্যোক্তা।

প্রশ্ন : ৭. বাই-মুরাবাহা বিনিয়োগ পদ্ধতি কী?

উত্তর : 'বাই-মুরাবাহা' আরবি শব্দ। بيع এবং ربح থেকে এসেছে। بيع অর্থ ক্রয়-বিধান এবং ربح অর্থ মুনাফা। কাজেই বাই-মুরাবাহা হচ্ছে লাভের ভিত্তিতে

বিক্রয়। মুরাবাহা হচ্ছে এমন একটি বিনিয়োগ পদ্ধতি, যেখানে ব্যাংক চুক্তি মোতাবেক গ্রাহকের অনুরোধে গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী নির্ধারিত মূল্যে তৃতীয় পক্ষ হয়ে কোন হালাল দ্রব্য ক্রয় করে, ক্রয় মূল্যের সাথে নির্ধারিত মুনাফা ধার্য করে, ভবিষ্যতে কোন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এককালীন বা কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের শর্তে বিক্রয় করা।

প্রশ্ন : ৮. বাই-মুয়াজ্জাল বিনিয়োগ কী?

উত্তর : 'বাই-মুয়াজ্জাল' শব্দটি আরবী। بيع এবং أجل শব্দ থেকে এসেছে। بيع শব্দটির অর্থ ক্রয়-বিক্রয় এবং أجل শব্দের অর্থ সময়। সুতরাং বাই-মুয়াজ্জাল হচ্ছে ভবিষ্যতে কোনো নির্ধারিত সময়ে মূল্য পরিশোধের শর্তে ক্রয়-বিক্রয় করা। অর্থাৎ ভবিষ্যতে নির্ধারিত কোনো সময়ে এক সাথে অথবা নির্ধারিত কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের শর্তে পণ্য সামগ্রী বিক্রয় করাকেই বাই-মুয়াজ্জাল পদ্ধতি বলে।

প্রশ্ন : ৯. বাই-সালাম বিনিয়োগ কী?

উত্তর : বাই-সালাম হচ্ছে অগ্রীম ক্রয়। এ পদ্ধতিতে পণ্যের ক্রেতা অগ্রীম মূল্য পরিশোধ করে দেয় এবং বিক্রেতা ভবিষ্যতে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে চুক্তি অনুসারে পণ্য সরবরাহ করে। এ পদ্ধতি বাই-মুয়াজ্জালের এর ঠিক বিপরীত। এ পদ্ধতিতে ব্যাংক হচ্ছে পণ্যের ক্রেতা এবং বিনিয়োগ গ্রহীতা হচ্ছে পণ্যের বিক্রেতা। সাধারণত কৃষি এবং শিল্পক্ষেত্রে চলতি মূলধন যোগানের জন্য এ পদ্ধতি খুবই কার্যকরী।

প্রশ্ন : ১০. মুশারাকা বিনিয়োগ পদ্ধতি কী?

উত্তর : মুশারাকা শব্দটি আরবি 'শিরক' শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ অংশীদারিত্ব। অতএব মুশারাকা বলতে এমন একটি অংশীদারী কারবারকে বুঝায়, যেখানে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান একত্রিত হয়ে কারবার পরিচালনা করে এবং কারবারের লাভ-ক্ষতিতে অংশগ্রহণ করে। কারবারে লাভ হলে অংশীদারগণ পূর্ব নির্ধারিত হারে ভাগ করে নেন এবং ক্ষতি হলে নিজ নিজ পুঁজির আনুপাতিক হারে তা বহন করেন।

১১. ইজারা পদ্ধতি কী?

উত্তর ঃ স্থায়ী প্রকৃতির সম্পদ ক্রয় বা তৈরী করে নির্ধারিত ভাড়ার বিনিময়ে অন্যকে ব্যবহার করতে দেওয়াই হচ্ছে ইজারা পদ্ধতি। যে সকল সম্পদ একবার দুবার ব্যবহার করলে নিঃশেষ হয়ে যায় না এবং যে সম্পদ ক্রয় করার মাধ্যমে

মালিককে ক্রয়-বিক্রয়ের ঝুঁকি বহন করতে হয়, সে সম্পদ অন্যকে ব্যবহার করতে দিয়ে ব্যবহারের বিনিময়ে ভাড়া আদায় করা যায়। যেমন, জমি, বাড়ি, গাড়ি ও জাহাজ ইত্যাদি।

১২. মুশারাকার শ্রেণীবিভাগগুলো কী কী?

উত্তর : মুশারাকা প্রথমত দুই প্রকার। যথা :

ক. শিরকাতুল মিল্ক

খ. শিরকাতুল উকুদ।

শিরকাতুল মিল্ক আবার দুই প্রকার। যথা :

ক. স্বেচ্ছামূলক

খ. বাধ্যতামূলক।

শিরকাতুল উকুদ আবার ৪ প্রকার।

ক. শিরকাতুল ইনান

খ. শিরকাতুল মুফাওয়াদা

গ. শিরকাতুল ছানাই বা আবদান

ঘ. শিরকাতুল ওয়াজুহ।

প্রশ্ন : ১৩. মুশারাকা কারবারের শর্তগুলো কী কী?

উত্তর : মুশারাকা কারবারের বৈশিষ্ট্য বা শর্তগুলো নিম্নরূপ :

ক. মুশারাকা কারবার শুরু করার পূর্বে এ ব্যাপারে লিখিত চুক্তি হওয়া আবশ্যক। চুক্তিপত্রে পুঁজির পরিমাণ, লাভ-ক্ষতির বণ্টন ও কারবার পরিচালনায় দায়-দায়িত্বের ব্যাপারে শর্ত উল্লেখ থাকা দরকার।

খ. অংশীদারদের মুনাফা প্রাপ্তির হার উল্লেখ থাকতে হবে, তবে কোনো অবস্থাতেই নির্ধারিত পরিমাণ মুনাফা কাউকে দেওয়া যাবে না।

গ. লোকসান অবশ্যই পুঁজি অনুপাতে বহন করতে হবে।

ঘ. মাল অংশীদারের কারবারের ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক নয়।

ঙ. কোন অংশীদার একই সাথে কারবারের কর্মচারী হলে তাকে নির্ধারিত হারে বেতন দেওয়া যেতে পারে।

প্রশ্ন : ১৪. মুদারাবা ও মুশারাকা কারবারের মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর ঃ মুদারাবা ও মুশারাকা কারবারের মধ্যে পার্থক্যগুলো নিম্নরূপ :

১. মুশারাকা কারবারের সকল অংশীদার পুঁজির যোগান দেয় কিন্তু মুদারাবা কারবারের একপক্ষ পুঁজির যোগান দেয় অপর পক্ষ কেবল শ্রম দেয়।

২. মুশারাকা কারবারে ইচ্ছে করলে সকল অংশীদারই কারবার পরিচালনায় অংশ নিতে পারে কিন্তু মুদারাবা কারবারে পুঁজির মালিক কারবার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে না।

৩. মুশারাকা কারবারের লোকসানের দায় সকল অংশীদার বহন করে কিন্তু মুদারাবার ক্ষেত্রে মুদারিব লোকসানের আর্থিক দায় বহন করে না।

প্রশ্ন : ১৫. হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্ক কী?

উত্তর : ব্যাংক যে বিনিয়োগ পদ্ধতিতে তার গ্রাহকের সাথে চুক্তি মোতাবেক একত্রে কোনো স্থায়ী প্রকৃতির সম্পদ ক্রয় করে এবং গ্রাহক কর্তৃক পর্যায়ক্রমে ব্যাংকের মূলধনের টাকা এবং ক্রমহ্রাসমান হারে ভাড়ার টাকা পরিশোধের শর্তে, যে ইজারা দেয় তাকে ইজারা বিল বাই বলে।

এ পদ্ধতিতে প্রথমত ব্যাংক ও গ্রাহক যৌথ মালিকানার ভিত্তিতে একটি সম্পদ ক্রয় করে। গ্রাহক পুরো সম্পদ ক্রয় করে এবং ব্যাংকের অংশের ভাড়া পরিশোধের সাথে সাথে ব্যাংকের অংশের মূলধনের টাকা ও ক্রমান্বয়ে পরিশোধ করতে থাকে। গ্রাহক ব্যাংকের মূলধনের টাকা যতই পরিশোধ করে, ততই ব্যাংকের মালিকানা কমতে থাকে এবং গ্রাহকের মালিকানা বাড়তে থাকে। এভাবে একদিন গ্রাহক ব্যাংকের মূলধনের সমুদয় অর্থ পরিশোধ করে, সম্পদের পূর্ণ মালিকানা লাভ করে।

ডা. জাকির আব্দুল করিম নায়েক-এর জীবনী

ডা. জাকির আব্দুল করিম নায়েক ১৯৬৫ সালের ১৫ অক্টোবর ভারতের মুম্বাইয়ে জন্মগ্রহণ করেন। মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিবিএস ডিগ্রী অর্জনের মাধ্যমে পেশায় একজন ডাক্তার হলেও ১৯৯১ সাল থেকে তিনি বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচারে একনিষ্ঠভাবে মনোনিবেশ করার ফলে চিকিৎসা পেশা থেকে অব্যাহতি নেন। মাত্র ২৬ বছর বয়সে কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে বিজ্ঞান, গঠনমূলক যুক্তি ও অন্যান্য প্রমাণাদির মাধ্যমে তিনি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াসী হন। এ সময়ে ইসলামের দাওয়াতের পাশাপাশি অমুসলিম ও অসচেতন মুসলিম বিশেষ করে শিক্ষিত মুসলিমদের মধ্য থেকে ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্তিপূর্ণ ধারণা ও বিশ্বাস দূরীকরণার্থে ভারতের মুম্বাইয়ে তিনি 'ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন' (আইআরএফ) নামক এক দাতব্য প্রতিষ্ঠান চালু করেন।

উল্লেখ্য যে, ইসলাম ও তুলনামূলক অন্যান্য ধর্মের উপরে সমগ্র বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তথ্যাবলি ইসলামিক রিচার্স ফাউন্ডেশনের সংগ্রহে রয়েছে। পরবর্তীতে তাঁরই উদ্যোগে আইআরএফ 'এডুকেশনাল ট্রাস্ট' ও 'ইসলামিক ডিমেনসন' নামক দুটি সংস্থাও প্রতিষ্ঠিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানগুলো তাঁদের সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত। এজন্য আন্তর্জাতিক স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল, ক্যাবল টিভি নেটওয়ার্ক (বিশেষত তাদের নিজস্ব টিভি নেটওয়ার্ক 'Peace TV', ইন্টারনেট এবং প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে বিশ্বের লাখ লাখ মানুষের কাছে এটি ইসলামের প্রকৃত রূপকে উপস্থাপনে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। গৌরবান্বিত কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের পাশাপাশি মানবীয় কারণ, যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ সাপেক্ষে এটি প্রকৃত সত্য সম্পর্কে পৃথিবীর মানুষের বোধগম্যতা ও ইসলামের শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাখ্যা প্রদান করে।

ডা. জাকির মূলত ইসলামের দাঈ'র অনন্য দৃষ্টান্ত। 'ইসলামিক রিচার্স ফাউন্ডেশন' গঠন ও তার পরিচালনার কঠিন সংগ্রামের পেছনে তিনিই প্রধান তদারককারী। আধুনিক ভাবধারার এই পণ্ডিতের ইসলাম ও তুলনামূলক অন্যান্য ধর্মের বিশ্লেষণে বিশ্ববিখ্যাত সুবক্তা ও বিশিষ্ট লেখক হিসেবেও জুড়ি নেই। তাঁর বক্তব্যের পক্ষে ব্যাপকভাবে অক্ষরে অক্ষরে গৌরবান্বিত কুরআন, সহীহ্ হাদীস ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলো থেকে তথ্য ও প্রমাণপঞ্জি, পৃষ্ঠা নম্বর, খণ্ড ইত্যাদিসহ উল্লেখ

করার কারণে যে কেউ তাঁর বক্তব্য বা প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করুক বা তাঁর এ পর্ব শ্রবণ করুক না কেন, সে বিস্মিত ও অভিভূত না হয়ে পারে না। জনসমক্ষে আলোচনার সুতীক্ষ্ণ ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিশ্বাসযোগ্য উত্তর প্রদানের জন্য তিনি সুপ্রসিদ্ধ।

অন্যান্য ধর্মের বিশিষ্ট ব্যক্তির সাথে আনুষ্ঠানিক আলোচনা (বিতর্ক) ও সংলাপের সময় বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় আল্লাহর রহমতে তিনি সফলতার সাথে বিজয়ী হয়েছেন। ২০০০ সালের ১ এপ্রিল আমেরিকার শিকাগো শহরের আইসিএনএই কনফারেন্সে 'বিজ্ঞানের আলোকে বাইবেল ও কুরআন' বিষয়ে এক আমেরিকান চিকিৎসক ও খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারক ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল-এর সঙ্গে তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল হচ্ছেন সেই লেখক যিনি তিন বছর ধরে গবেষণা করার পর 'ইতিহাস ও বিজ্ঞানের আলোকে কুরআন ও বাইবেল' (১৯৯২ সালে ১ম সংস্করণ এবং ২০০০ সালে ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়) নামক দুটি গ্রন্থ লিখতে সমর্থ হন, যে বইটিকে তিনি ১৯৭৬ সালে ডা. মরিস বুকাইলির লেখা 'বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান' নামক বইটির উত্থাপিত অভিযোগগুলোর খণ্ডনকারী হিসেবে ধারণা করেন। শেখ আহমাদ দীদাত ১৯৯৪ সালে ডা. জাকির নায়েককে ইসলাম ও তুলনামূলক অন্যান্য ধর্ম বিষয়ে বিশ্ববিখ্যাত বক্তা হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং ২০০০ সালের মে মাসে দাওয়াহ্ ও তুলনামূলক অন্যান্য ধর্মের উপর গবেষণার জন্য 'হে তরুণ! তুমি যা চার বছরে করেছ, তা করতে আমার চব্বিশ বছর ব্যয় হয়েছে– আলহামদুলিল্লাহ' খোদাই করা একটি স্মারক প্রদান করেন।

জনসমক্ষে আলোচনার জন্য ডা. জাকির বর্তমান খ্রিস্টান ধর্মগুরু পোপ বেনেডিক্টকে চ্যালেঞ্জ করেন, যা সারাবিশ্ব অবলোকন করেছে। বেনেডিক্ট নবী মুহাম্মদ এর বিরুদ্ধে অসম্মানজনক ও বিতর্কিত মন্তব্য করায় সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ক্ষোভ স্ফুলিঙ্গের মতো দাউ দাউ করে জ্বলছিল। তাই মুসলিমদের এ উদ্বেগ নিবারণ করতে পোপ বিশটি ইসলামিক দেশ থেকে কূটনীতিকদেরকে রোমের দক্ষিণে তার গ্রীষ্মকালীন বাসভবনে আলোচনার জন্য আহ্বান জানায়। কিন্তু ডা. জাকির তাকে একটি প্রকাশ্য সংলাপের জন্য আহ্বান করে বলেন যে, 'ইসলাম সম্পর্কে তার এই বিতর্কিত মন্তব্যের ফলে মুসলিম বিশ্বব্যাপী যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তা শান্ত করতে এটি যৎসামান্য প্রচেষ্টা মাত্র। মূলত ইসলাম সম্পর্কে পোপের এ মন্তব্য পূর্বপরিকল্পিত। পোপ জার্মানির রিজেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে যা বলেছিলেন সে ব্যাপারে তিনি নিজেই ভালোভাবে অবগত।

তাই মুসলিমদের প্রতি পোপের এ দুঃখ প্রকাশ করাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেওয়ারই নামান্তর। পোপের উচিত ছিল গভীরভাবে দুঃখ প্রকাশের পাশাপাশি তার মন্তব্য তুলে নেওয়া। দেখে মনে হয়, প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের পদাঙ্কই পোপ বেনেডিক্ট অনুসরণ করে চলছেন। ডা. জাকির আরো বলেন, পোপ যদি সত্যিই সঠিক সংলাপের মধ্য দিয়ে এ উত্তেজনা শান্ত করতে প্রয়াসী হন, তাহলে তার উচিত হবে জনসমক্ষে একটি প্রকাশ্য বিতর্ক করা। বিশ্বব্যাপী সম্প্রচারের সুবিধা সম্বলিত আন্তর্জাতিক টিভি নেটওয়ার্কের ক্যামেরার সম্মুখে পোপ বেনেডিক্ট-এর সঙ্গে আমি জনসমক্ষে প্রকাশ্য সংলাপ বা বিতর্কে অংশ নিতে দৃঢ়ভাবে ইচ্ছুক। এর ফলে সারা বিশ্বের ১ কোটি ৩০ লাখ মুসলমান ও ২ কোটি খ্রিস্টান এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা সেই বিতর্ক অনুষ্ঠান দেখতে ও শুনতে পারবে।

পোপের ইচ্ছেমতোই কুরআন ও বাইবেল-এর যে কোনো বিষয়ের উপর সংলাপে বা বিতর্কে আমি রাজি। তাছাড়া এটা কেবল বিতর্ক অনুষ্ঠানই হবে না; বরং এখানে উপস্থিত ও অনুপস্থিত দর্শক-শ্রোতার জন্য প্রশ্নোত্তর পর্বও থাকতে হবে। আর এটা পোপের ইচ্ছামতো কোনো রুদ্ধদ্বার বৈঠক হবে না, যেমনটা তার পূর্বসূরী দ্বিতীয় পোপ জন পল দক্ষিণ আফ্রিকান ইসলামি পণ্ডিত আহমেদ দীদাতের খোলামেলা সংলাপের আহ্বানে চেয়েছিলেন। শেখ দীদাতকে পোপ জন পল তার নিজের কক্ষে এসে বিতর্ক করতে বলেছিলেন।

একটি আন্তঃবিশ্বাসগত সংলাপ কেন রুদ্ধদ্বারের মধ্যে সংঘটিত হবে? উপরন্তু আমার জন্য যদি একটি ইটালিয়ান ভিসা সংগ্রহ করা হয় তাহলে মুসলমানদের প্রতিনিধি হিসেবে পোপের সাথে বিতর্ক করতে আমি রোম বা ভ্যাটিক্যানে নিজের খরচায়ও যেতে পারি। তবে একথা সবার মনে রাখতে হবে যে, মুসলমানদের নিজস্ব মিডিয়াই হচ্ছে ইসলামের উপরে আক্রমণের জবাবে প্রচণ্ডভাবে আঘাত হানার উৎকৃষ্ট উপায়। দুর্ভাগ্যক্রমে অধিকাংশ আন্তর্জাতিক মিডিয়া পশ্চিমা সমর্থনপুষ্ট। সুতরাং আমাদের যদি নিজস্ব মিডিয়া না থাকে তাহলে পশ্চিমারা সাদাকে কালো করে ফেলবে, দিনকে রাত করে ফেলবে, নায়ককে সন্ত্রাসী বানাবে আর সন্ত্রাসীকে বানাবে নায়ক।'

রিয়াদে অবস্থিত শ্রীলংকার দূতাবাস কর্তৃক আয়োজিত বহুসংখ্যক রাষ্ট্রদূত, কূটনীতিক ও শ্রীলংকার জনগণের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত 'ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা সম্পর্কিত ২০টি সাধারণ প্রশ্ন' শীর্ষক আলোচনা সভায় ডা. জাকির তাঁর বক্তব্যের শেষে এক ইন্টারনেট সাক্ষাৎকারে এ কথাগুলো বলেন।

ষোড়শ পোপ বেনেডিক্ট যদি খ্রিস্টান ধর্ম ও বাইবেলের উপর কোনো বিশ্বাস না রাখেন, তাহলে তার কোনো সমস্যা থাকার কথা নয়; বরং জনসমক্ষে একটা বড় আকারের খোলামেলা বিতর্কের মাধ্যমে ডা. জাকিরের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা উচিত। কিন্তু পোপের যদি খ্রিস্টান ধর্ম ও বাইবেলের উপর আত্মবিশ্বাস না থাকে অথবা তিনি যদি খ্রিস্টান ধর্ম ও বাইবেলকে ততটুকু পরিমাণে বিশ্বাস না করেন যাতে বড় রকমের কোনো বিতর্কে অংশগ্রহণ সম্ভব নয়; তাহলে মুসলমানদের অপেক্ষা করতে হবে যতক্ষণ না এই পোপ বেনেডিক্ট তার জ্ঞান ও আত্মবিশ্বাসের পরিধি বাড়ানোর মাধ্যমে ডা. জাকিরের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে অথবা পদত্যাগ করার মাধ্যমে পরবর্তী পোপকে এ সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করার নিশ্চয়তা দেন। অবশেষে যদি এ বিতর্ক পরিচালিত হয়, তাহলে ইনশাআল্লাহ আমরা ইসলাম সম্পর্কে সমগ্র বিশ্বের মানুষের ভ্রান্তধারণা দূর করতে সক্ষম হব এবং সমগ্র বিশ্বের সম্মুখে ইসলামের সত্যতা ও খ্রিস্টান ধর্মের মিথ্যাচারিতা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যাবে।

মুসলমানদের সাথে সংলাপ করার জন্য পোপ বেনেডিক্ট অবশ্য প্রথমাবস্থায় তার আন্তরিক ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন; কিন্তু ডা. জাকিরের আহ্বানের পর থেকে এমন ভঙ্গিমা দেখাচ্ছেন যে, মনে হয় মুসলমানদের সাথে সংলাপের জন্য তিনি কখনো আহ্বানই জানান নি অথবা এ ধরনের কোনো কিছু সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। বিশ্বের অনেক মুসলমান পোপ বেনিডিক্ট-এর সাথে ডা. জাকির নায়েকের চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে পশ্চিমা মিডিয়া যেমন : বিভিন্ন জনপ্রিয় টিভি চ্যানেল, পত্র-পত্রিকার অফিসে ই-মেইল করেছে; কিন্তু তারাও পোপের ভান করছে। তাই সমগ্র মুসলিম বিশ্বের আজ একটাই প্রশ্ন, ডা. জাকির নায়েকের চ্যালেঞ্জে সমগ্র পশ্চিমা মিডিয়া বিশেষ করে পোপ নিজেই কেন এমন নিশ্চুপ?

ডা. জাকির সাধারণত লিখিত কোনো বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন না; বরং সর্বদা জনসমক্ষে বিতর্ক করেন। কারণ, এটা সবার জানা কথা যে, লিখিতভাবে কোনো বিতর্ক করলে তা কখনো শেষ হবার নয়; কিন্তু প্রকাশ্যে বিতর্ক করলে তা কার্যকরীভাবে একটা ফলাফল বয়ে আনে।

যুক্তরাষ্ট্রের লস এঞ্জেল্স বিমানবন্দরের একটি ঘটনায় তাঁর দক্ষতা সম্পর্কে একটি উদাহরণ দেওয়া যাক :

১১ সেপ্টেম্বরের পর থেকেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে মুসলমানদের যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণে অনেক বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে। ফলে যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণে অধিকাংশ মুসলিম বিভিন্ন প্রশ্নের যথোপযুক্ত উত্তর দিতে না পারার জন্য অযথা হয়রানির শিকার হন। কিন্তু ইসলাম ও মানবতার প্রতি অবদানের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের

'ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইন্টারনেট ইউনিভার্সিটি' কর্তৃক দেওয়া পুরস্কার গ্রহণ করতে ১২ অক্টোবর ডা. জাকির নায়েক যখন লস এঞ্জেল্স বিমানবন্দরে অবতরণ করেন তখন তাঁর ক্ষেত্রে এমনটি ঘটেছে কি-না তা জানতে ইমিগ্রেশন অফিসারের আচরণ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'আমার জন্য সেখানে কোনো সমস্যা ছিল না এবং তাদের সবার ব্যবহার ছিল মনোমুগ্ধকর।' কয়েকটি সৌদি সংবাদপত্র ডা. জাকির নায়েকের এ সাক্ষাৎকার নেওয়ার পরবর্তী অনুসন্ধানে জানতে পারে যে, লস এঞ্জেল্স বিমানবন্দরে অবতরণের পর ডা. জাকিরও তার দাড়ি এবং মাথার টুপির জন্য কাস্টম অফিসারদের দৃষ্টির আড়াল হতে পারেন নি। তাই সাথে সাথে তাঁকেও প্রশ্ন করার জন্য অনুসন্ধান করা শুরু করে।

যেমন : ১১ সেপ্টেম্বরের আক্রমণ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে জানতে চেয়ে 'জিহাদ' শব্দটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। তখন ডা. জাকির নায়েক বাইবেলের বিভিন্ন সংস্করণ, কুরআন, তালমুদ, তাওরাত (ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ), মহাভারত, ভগবত গীতাসহ অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দেওয়ার মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে, জিহাদ শুধু ইসলামিক নয় বরং বৈশ্বিক একটি বিষয়। এ কথা শুনে কাস্টম অফিসাররা উৎসাহী হয়ে আরো প্রশ্ন করেন। কিন্তু ওদিকে ডা. জাকির তাঁর মেধা, জ্ঞান ও যুক্তি দ্বারা উত্তর দেওয়ার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখেন। ইতোমধ্যে এক ঘণ্টা সময় পার হয়ে যায়। অন্যদিকে যেহেতু প্রশ্ন করার কারণে দীর্ঘ লাইনে লোকজন অপেক্ষা করছিল তাই ডা. জাকিরকে যাওয়ার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়। যখন তিনি উঠে দাঁড়ান ও কক্ষটি ত্যাগ করেন তখন প্রায় ৭০ জন কাস্টমস্ অফিসার তাদের নিজেদের ধর্ম ও ইসলাম সম্পর্কে জানতে তাঁর পিছে পিছে যাচ্ছিল। পরবর্তীতে কাস্টমস্ অফিসারগণ বলেন যে, তারা বিস্মিত হয়েছেন এবং তারা জীবনে কখনো এতো জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি দেখেন নি।

আমেরিকা, কানাডা, ইংল্যান্ড, সৌদি আরব, আরব আমিরাত, কুয়েত, কাতার, বাহরাইন, সাউথ আফ্রিকা, মৌরিতানিয়া, অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া, সিংগাপুর, হংকং, থাইল্যান্ড, ঘানা (দক্ষিণ আফ্রিকা) সহ আরো অনেক দেশে এ পর্যন্ত নয়শো'রও বেশি বার জনসম্মুখে প্রকাশ্য আলোচনায় বিভিন্ন ধর্ম বিশেষ করে ইসলাম, খ্রিস্টান ও হিন্দু ধর্মের উপর তুলনামূলক বক্তব্য দিয়েছেন। উপরন্তু ভারতেও তিনি অসংখ্য বার বক্তব্য প্রদান করেছেন। যার অধিকাংশ অডিও এবং ভিডিও আকারে এবং ইদানীং বিভিন্ন ভাষায় গ্রন্থাকারে পাওয়া যায়। বিশ্বের একশো'রও বেশি দেশের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক টিভি ও স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলে ডা. জাকিরকে প্রতিনিয়ত দেখা যায়। তিনি প্রায় প্রতিনিয়তই সাক্ষাৎকারের জন্য আমন্ত্রিত হন।

ভারতের মিডিয়া ছাড়াও আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় রয়েছে তাঁর প্রভাব। ভারতীয় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা যেমন : ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ইনকিলাব, দ্যা ইন্ডিপেন্ট, দ্যা ডেইলি মিডডে, দ্যা এশিয়ান এইজ ছাড়াও অন্যান্য পত্রিকা তাঁর অনেক বক্তব্য প্রকাশ করেছে। বাহরাইন ট্রিবিউন, রিয়াদ ডেইলি, গালফ টাইমস, কুয়েত টাইমসসহ আরো অন্যান্য সংবাদপত্রে ইংরেজি ছাড়াও বিভিন্ন ভাষায় ডা. জাকির নায়েক সম্পর্কে অনেক প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও তাঁর বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে।

তিনি সাধারণত ইংরেজিতে বক্তব্য দেন। তাঁর দর্শক-শ্রোতার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন দেশের সম্মানিত রাষ্ট্রদূত, আর্মি জেনারেল, রাজনৈতিক নেতা, নামকরা খেলোয়াড়, ধর্মীয় পণ্ডিত, শিল্প ও বাণিজ্য সংগঠক এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ মানুষ। তাঁর অধিকাংশ বক্তব্য ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের নিজস্ব নেটওয়ার্ক 'Peace TV'- এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী প্রচারিত হয়। তাঁর বক্তব্যগুলোতে খুবই সাধারণ ভূমিকা রয়েছে এবং একজন আন্তর্জাতিক বক্তা হিসেবে তিনি তাঁর প্রায় সকল বক্তব্যে কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের বাণীগুলো বিজ্ঞান ও যুক্তির মাধ্যমে বিশ্লেষণ করেন। ফলে দর্শক ও শ্রোতারা সহজেই ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হন। ধর্মগ্রন্থগুলো সম্পূর্ণভাবে মুখস্থ করার মতো অসাধারণ গুণটি তাঁর সম্পর্কে বিশেষভাবে লক্ষণীয় একটি বিষয়। মনে হয় কুরআন, বাইবেলের বিভিন্ন সংস্করণ, তালমুদ, তাওরাত (ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ), মহাভারত, ম্যানুসম্যারিটি, ভগবতগীতা ও বেদসহ অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলোর হাজার হাজার পৃষ্ঠা সম্পূর্ণভাবে তাঁর মুখস্থ রয়েছে। তাছাড়াও বৈজ্ঞানিক ও গাণিতিক বিষয় এবং তত্ত্বেও রয়েছে তাঁর পূর্ণ দখল। কেননা তিনি কোনো তথ্যসূত্র উল্লেখ করলে তার পৃষ্ঠা, অধ্যায় ও খণ্ডসহ উল্লেখ করেন।